# দেখা আলো না দেখা রূপ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| আলো | ৫ |
| আলোর বেগ | ৫ |
| আলো ও আইনস্টাইনের তত্ত্ব | ৬ |
| আলো সরল রেখায় যায় | ৮ |
| প্রতিফলন | ১০ |
| প্রতিসরণ | ১৩ |
| বিশোষণ | ১৮ |
| পূর্ণঅভ্যন্তরীণ প্রতিফলন | ২০ |
| লেন্স | ২৪ |
| লেন্সের ব্যবহার | ২৮ |
| আলো ও তরঙ্গ | ৩১ |
| বর্ণালী | ৩৫ |
| আলোর ব্যতিচার | ৩৮ |
| আলোর পরিবর্তন | ৪১ |
| আলোর বিপেক্ষণ | ৪৩ |
| অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ | ৪৪ |
| পোলারায়ণ | ৪৬ |
| চোখ | ৪৮ |
| রঙ | ৫৩ |
| চোখের অন্য ব্যবহার | ৫৭ |
| দেখা, দেখে না দেখা, না দেখে দেখা | ৬১ |
| আলোর উৎস | ৬৩ |
| পরিশিষ্ট | ৬৪ |

# আলো

আমরা ঘুম থেকে উঠি যখন সূর্য উঠে যায় কিংবা উঠি উঠি করতে থাকে, অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটতে থাকে। কেউ কেউ আবার অনেক বেলা করে ওঠে, চারদিকে যখন ফুটফুটে রোদ। সারাদিন আমরা নিজেদের কাজকর্ম করি, নানাভাবে নিজেদের ব্যস্ত রাখি। ঠিক সন্ধ্যাবেলায় যখন চারদিক আঁধার হয়ে আসতে থাকে তখন তাড়াতাড়ি আমরা ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বেলে দিই। যতক্ষণ জেগে থাকি সারাক্ষণ আলো জ্বালিয়ে রাখি। ঠিক ঘুমোনোর আগে আলো নিভিয়ে দিয়ে আমরা বিছানায় শুয়ে পড়ি। বিছানায় শুয়ে আমরা চোখ বন্ধ করে ফেলি ঘুমোনোর জন্যে, চোখ খোলা রেখে তো আর ঘুমোনো যায় না! আবার যখন ঘুম থেকে উঠি তখন চারদিকে ঝকঝকে আলো!

কাজেই দেখতে পারছ এক মুহূর্তের জন্যে আমরা আলো ছাড়া থাকি না। আলো না থাকলে আমরা ভীষণ অসহায়, এমনকি রাতে ঘুমোনোর সময় আমরা হাতের কাছে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করে রাখি, হঠাৎ করে যদি অন্ধকারে উঠতে হয়। তোমরা যারা গ্রামে থাক তারা নিশ্চয়ই জান অমাবস্যার রাতে যখন আকাশে মেঘ করে তারা পর্যন্ত ঢেকে যায় তখন বাইরে কি রকম অন্ধকার হয়। চোখ খুলেও বোঝা যায় না চোখ খুলেছি কি না! হয়তো কখনো কখনো ওরকম অন্ধকারে থাকতে হলে আমরা আলোর সত্যিকার গুরুত্ব বুঝতে পারতাম। কিছু করার না থাকলে কখনো হয়তো চুপচাপ বসে ভাবতাম আলো জিনিসটা কি, কিভাবে সেটা তৈরি হয় কিংবা কিভাবে আমরা দেখতে পাই!

# আলোর বেগ

আমরা কখনো আলো নিয়ে ভেবেছি কি না সেটা এক্ষুণি বোঝা যাবে। তোমার ঘরে বাতি জ্বালানোর কতক্ষণ পর বাতি থেকে আলোটা ঘরের দেয়ালে এসে পৌঁছায়? অনেকেই হয়তো ভাবছ সাথে সাথেই, আমরা তো কখনো দেখিনি আলো আস্তে আস্তে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে! কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই। হয়তো ঠিক গুড়ি মেরে এগিয়ে আসেনি, কিন্তু বাতি থেকে দেয়াল পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে আলোর খানিকটা সময় ঠিকই লেগেছে। সময়টা এত কম যে আমরা কখনো সেটা ধরতে পারব না। আলোর বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তাই তোমার ঘরের ভেতর বাতি থেকে আলো দেয়ালে পৌঁছুতে হয়তো এক কোটি ভাগের এক সেকেণ্ড সময় লেগেছে, সেটা খালি চোখে বোঝা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু মনে রেখো সেটা সাথে সাথে আসেনি, যত কমই হোক খানিকটা সময় ঠিকই লেগেছে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যেটা সাথে সাথে হয়ে যায়!

আলোর বেগ এত বেশি যে সেটা মাপা এক সময়ে খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে গ্যালিলিও ইতালিতে তার সহকারীকে নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। দুজনে হাতে একটা করে বাতি নিয়ে আলোর যেতে এবং ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে মাপার চেষ্টা করেছিলেন—বুঝতেই পারছ সেটা সম্ভব হবার কথা নয়। ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে ডেনমার্কের রোমার নামের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রান্সে প্রথম আলোর বেগ মেপেছিলেন। তিনি বৃহস্পতি গ্রহের একটা চাঁদকে সারা বছর লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন। পৃথিবী আর বৃহস্পতির দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেই চাঁদ থেকে আলোর পৃথিবীতে পৌঁছাতেও দেরি হতে লাগল। কতটুকু দূরত্ব বেড়ে যাওয়াতে কতটুকু সময় বেশি লাগছে জানার পর আলোর বেগ বের করা সহজ ব্যাপার। তার হিসাবে আলোর বেগ ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মাইল, সত্যিকার বেগ থেকে বাষট্টি হাজার মাইল কম। তবুও সবাই বুঝতে পেরেছিল আলো সাথে সাথে কোথাও যেতে পারে না, খানিকটা সময় ঠিকই দরকার।

রোমারের পরে অনেক বিজ্ঞানীই আলোর বেগ আরো ভালভাবে মেপেছেন। এমন কি আজকালও পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় ল্যাবরেটরিতে আলোর বেগ আরো নিখুঁতভাবে মাপার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেজন্যে অবশ্যি আর গ্রহ-নক্ষত্র ব্যবহার করতে হয় না, ঘরে বসেই করা সম্ভব। সেসব পদ্ধতি বুঝতে হলে আরো অনেক কিছু জানা দরকার।

## আলো ও আইনস্টাইনের তত্ত্ব

মনে কর কেউ তোমাকে গুলি করেছে (ঘাবড়ানোর কিছু নেই, সত্যি সত্যি কেউ গুলি করছে না, শুধু কল্পনা করে নাও), বন্দুক থেকে গুলিটা বের হয়ে প্রচণ্ড বেগে তোমার দিকে ছুটে আসছে আর ভয় পেয়ে তুমি প্রাণপণে ছুটতে থাকলে। (গুলি থেকে জোরে ছোটা সম্ভব নয়, তবুও খানিকক্ষণের জন্যে ধরে নেয়া যাক তুমি তাও পার!)। তুমি ছুটছ তোমার পেছনে গুলি আসছে। তুমি এক সময়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলে গুলি একেবারে কাছে চলে এসেছে, তোমার থেকে মাত্র এক ফুট দূরে! তুমি তোমার ছোটার বেগ আরো বাড়িয়ে দিলে, বাড়াতে বাড়াতে একেবারে গুলির সমান বেগে ছোটা শুরু করেছ। এখন গুলি যত বেগে ছুটছে তুমিও ঠিক তত বেগে ছুটছ, কাজেই গুলি আর কখনো তোমাকে ধরতে পারবে না, ঠিক তোমার এক ফুট পেছনে থেকে তোমার পিছু পিছু আসবে। এবারে তুমি তোমার বেগ আরো বাড়িয়ে দিয়ে গুলি থেকে জোরে ছুটতে থাক, দেখবে গুলি পিছিয়ে পড়বে আর তুমি গুলিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে সামনে।

ঠিক এই ব্যাপারটি হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু এই ধরনের ব্যাপার সবসময়ই হয়ে থাকে। দু'টি জিনিস সমান বেগে ছুটতে থাকলে একটির তুলনায় আরেকটির বেগ শূন্য বলা মোটেও ভুল নয়। দু'টি গাড়ি সামনাসামনি ধাক্কা লেগে মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে ধাক্কা লাগলে বড় কিছু ক্ষতি হয় না। কারণ যদিও দুটি গাড়িই হয়তো পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটছে, কিন্তু একটির তুলনায় আরেকটি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দুটি স্থির জিনিসের ধাক্কা লাগলে কি আর হবে? পৃথিবী সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তাই পৃথিবীর সব জিনিসই সাথে সাথে সেকেণ্ডে আঠারো মাইল

বেগে ছুটছে। তুমি কি কখনোই সেটা বুঝতে পার? পার না এবং পারবেও না, কারণ তুমিও সব জিনিসের সাথে সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটছ!

এবারে একটা মজার জিনিস দেখা যাক। মনে কর তুমি একটা রকেটে করে যাচ্ছ। নিঃসন্দেহে খুব ভাল রকেট, সত্যিকার রকেট সেকেণ্ডে দশ-পনেরো মাইলের বেশি যেতে পারে না, কিন্তু তোমার রকেট অনায়াসে সেকেণ্ডে এক লক্ষ মাইল যায়। তুমি পৃথিবী থেকে আলফা সেনচুরীতে রওনা দিয়েছ সেকেণ্ডে এক লক্ষ মাইল বেগে (আলফা সেনচুরী পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র, সাড়ে চার আলোকবর্ষ দূরে অর্থাৎ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে আলফা সেনচুরী থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সাড়ে চার বৎসর সময় নেয়)। যাই হোক, তুমি যখন সেকেণ্ডে এক লক্ষ মাইল বেগে যাচ্ছ, তখন পৃথিবী থেকে কেউ একজন তোমার দিকে আলো জ্বেলে দিল—সে আলো তোমার দিকে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুটে আসছে। তখন তোমার কি মনে হবে? স্বাভাবিক ভাবেই মনে হওয়া উচিত আলোটা তুলনামূলকভাবে অনেক ধীরে (মাত্র ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে) তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল ঠিক তখনো তোমার মনে হবে আলো ঠিক এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে তোমার দিকে ছুটে আসছে।

এবারে ধরা যাক তুমি তোমার রকেটের বেগ আরো বাড়িয়ে আলোর গতিবেগের প্রায় সমান করে দিলে। এখন আলো ছুটছে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে, তুমিও ছুটছ প্রায় সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। তখন তোমার কি মনে হবে? নিশ্চয়ই মনে হওয়া উচিত আলো কখনো তোমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জান? আলো শুধু যে তোমাকে ধরে ফেলবে তাই নয়, তুমি দেখবে আলো তোমাকে এসে স্পর্শ করছে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে।

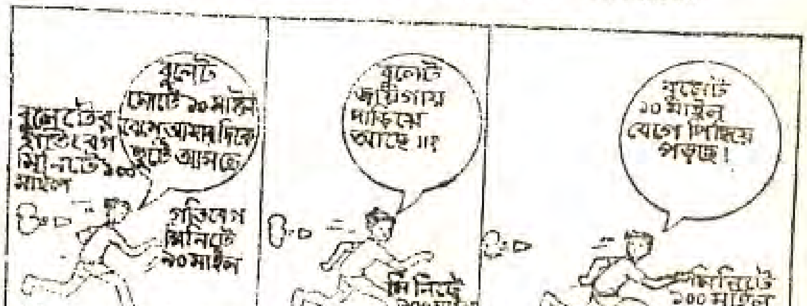


দৈনন্দিন জীবনে আপেক্ষিক গতিবেগ হচ্ছে দুটি গতিবেগের পার্থক্য

নিশ্চয়ই আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। আইনস্টাইন ছাব্বিশ বছর বয়সে যখন প্রথম এটা বলেছিলেন তখনও অনেকে কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। অনেক বিজ্ঞানী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন যে আইনস্টাইন যা

বলেছেন তা সত্যি। আলোর গতিবেগ সব অবস্থাতেই সমান থাকে—এটি হচ্ছে আইনস্টাইনের বিখ্যাত বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রথম সূত্রটি।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী আরো অনেক অনেক মজার ব্যাপার ঘটে। যেমন পৃথিবীর কোন কিছুরই গতিবেগ আলোর গতিবেগ থেকে বেশি হতে পারবে না। আলোর গতিবেগের সমান হতে পারবে শুধু সেই সব জিনিস যার কোন ওজন বা ভর নেই। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। পারমাণবিক বোমাতে সত্যি সত্যি তাই করা হয়। আপেক্ষিক তত্ত্ব সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে সময় সম্পর্কে। সম্পর্কে যেমন, কেউ যদি গতিশীল হয় তাহলে তার সময় ধীরে ধীরে কাটবে। অর্থাৎ একজন যদি রকেটে করে প্রচণ্ড বেগে ঘুরে আসে, সে এক বছর পর পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবে পৃথিবীতে হয়তো একশ বছর কেটে গেছে!

আলোর কোন আপেক্ষিক গতিবেগ নেই, এটি সব সময়েই সমান

মনে করো না এসব বুঝি শুধু কাগজ কলম আর হিসাব নিকাশের ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা প্রত্যেকটি জিনিস পরীক্ষা করে দেখেছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপেক্ষিক তত্ত্ব পুরোপুরি আলোর গতিবেগের সাথে সম্পর্কিত। এই গতিবেগের কোন পরিবর্তন হয় না বলে একে বলা হয় ধ্রুব সংখ্যা। পদার্থ বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে প্রথম এটি জানতে হয়। কাজেই তোমরাও চেষ্টা করবে এটি মনে রাখতে, সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার (নিখুঁত ভাবে বললে ২৯৯৭৯২.৫ কিলোমিটার)।

## আলো সরলরেখায় যায়

এবারে আলোর আরো সহজ ধর্মে ফিরে আসি। আলোর যে জিনিসটি আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে যে আলো সরলরেখায় যায় (না হলে কি মুশকিল যে হত!)। এ জন্যে জিনিসের ছায়া পড়ে এবং আমরা পাশের ঘরে কি হচ্ছে দেখতে পারি না। আলোর সরলরেখায় যাওয়ার ধর্মকে ব্যবহার করে আমরা কয়েকটা মজার পরীক্ষা করতে পারি।

নিচের ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে ঠিক সেভাবে সাদা দেয়ালের পাশে একটা হার্ডবোর্ড (খাতার মলাট বা এই ধরনের কিছু) কোনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখ। এখন বোর্ডের মাঝামাঝি খুব সাবধানে সুঁই বা পিন দিয়ে একটা সরু ফুটো কর। এবারে বোর্ডের একপাশে একটা মোমবাতি এমন ভাবে জ্বালিয়ে দাও যেন মোমবাতির শিখাটি আর সরু ফুটোটি একই উচ্চতায় থাকে।

সরলরেখায় গিয়ে প্রতিচ্ছবি তৈরি করছে

এবারে মোমবাতিটি ছাড়া অন্য সব আলো নিভিয়ে ঘরকে অন্ধকার করে ফেললেই দেখবে বোর্ডের অন্যপাশে দেয়ালে মোমবাতির অবিকল একটা ছবি ফুটে উঠেছে। একটিই শুধু পার্থক্য, ছবিটা উল্টো। ছবিটা কেন দেখা যাচ্ছে আর উল্টোভাবেই বা কেন তৈরি হচ্ছে কারণটা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। আলো সরলরেখায় যায়, তাই মোমবাতির বিভিন্ন বিন্দু থেকে আলো সরলরেখায় গিয়ে দেয়ালের বিভিন্ন বিন্দুতে পড়ে একটি ছবির সৃষ্টি করেছে। ফুটোটি মাঝখানে থাকায় মোমবাতির উপরের বিন্দু থেকে আলো শুধু নিচে যেতে পারে আবার নিচের কোন বিন্দু থেকে আলো শুধু উপরেই যেতে পারে—তাই ছবিটি তৈরি হয় উল্টোভাবে। যদিও সবসময়ই সব কিছু থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু কখনো তাদের ছবি এখানে সেখানে সৃষ্টি হয়ে যায় না, তার কারণ একই বিন্দুতে অনেকগুলি বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন বিন্দু থেকে আলো এসে পড়ার পর কোনটিই আলাদা করে বোঝা যায় না, তাই কোন ছবিই তৈরি হতে পারে না।

এই পরীক্ষাটি খুব মজার, কিন্তু এটি দেখার জন্যে ঘর অন্ধকার করতে হয়, তাই হয়তো সব সময়ে সবাইকে দেখানো সম্ভব নয়। একটু অন্য রকম ভাবে এই পরীক্ষাটিই করা সম্ভব, তার জন্যে একটা ছোটখাটো কাগজ বা হার্ডবোর্ডের বাক্স দরকার। বাক্সের একদিকে পিন বা সুচ দিয়ে একটা সরু ফুটো করে নাও। লক্ষ্য রাখতে হবে আলো যেন অন্য কোন দিক দিয়ে ঢুকতে না পারে। দরকার হলে কাগজে আঠা দিয়ে কোনাগুলো ঢেকে দেয়া ভাল। এবারে দেখার জন্যে একটা অর্ধস্বচ্ছ পর্দা দরকার। একটা সাদা কাগজে খানিকটা তেল মাখিয়ে নিলেই সেটি চমৎকার পর্দার কাজ করবে। এবারে পর্দাটা বুদ্ধি করে

বাক্সের মাঝামাঝি লাগিয়ে নিতে পারলেই (নিচের ছবি) হয়ে গেল। বাইরে নিয়ে আলোকিত কোনকিছুর দিকে তাকাও, দেখবে তার চমৎকার নিখুঁত একটি উল্টো ছবি

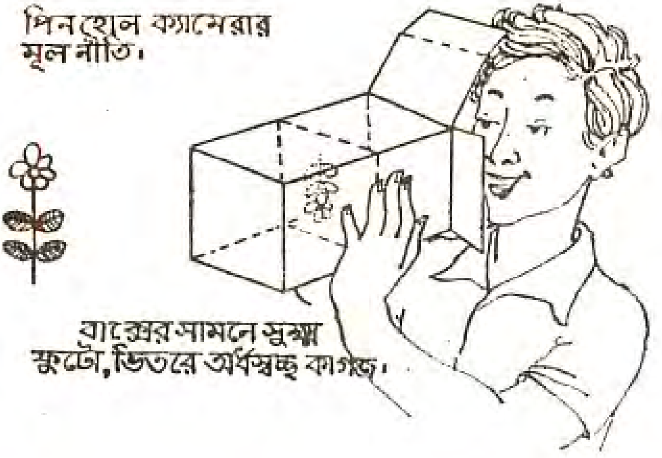


ভেসে উঠছে। অর্ধস্বচ্ছ পর্দাটা সামনে পিছে নিয়ে তুমি ইচ্ছে করলে ছবিটাকে ছোট বড় করতে পারবে। আগে এভাবে ক্যামেরা তৈরি করে ছবি তোলা হত। পিন দিয়ে ফুটো করা হত বলে এর নাম ছিল পিনহোল ক্যামেরা!

## প্রতিফলন

এবারে আলোর আরো কয়টি ব্যবহার পরীক্ষা করে দেখা যাক। আলো যখনি কোনকিছুর উপর এসে পড়ে তখন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার ঘটতে পারে—প্রতিফলন, প্রতিসরণ আর প্রতিশোষণ। যদিও প্রতিফলন বলতেই আমাদের শুধু আয়না বা আয়নার মত মসৃণ কোন জিনিসের কথা মনে পড়ে, আসলে প্রতিফলন কিন্তু যে কোন ধরনের জিনিস থেকেই হতে পারে। জিনিসটি মসৃণ হলে (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে দিক পরিবর্তন করে, এ ছাড়া রশ্মিটি অবিকৃত থাকে। কিন্তু জিনিসটির পৃষ্ঠ অমসৃণ হলে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আয়না বা অন্য কোন মসৃণ পৃষ্ঠে প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব, কিন্তু অমসৃণ পৃষ্ঠ থেকে কখনোই তা দেখা সম্ভব নয়। অমসৃণ পৃষ্ঠ মানেই কিন্তু গিরগিটির চামড়ার মত খসখসে বা খোয়া ছড়ানো রাস্তার মত এবড়োখেবড়ো জিনিস নয়। কাগজ, কাপড়, কাঠের মত আমাদের পরিচিত প্রায় অনেক জিনিসই আলোর কাছে অমসৃণ, যদিও খালি চোখে সেগুলোকে আমাদের যথেষ্ট মসৃণ বলেই মনে হয়। মসৃণ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলনের পার্থক্য বেশ সহজেই বোঝা সম্ভব। ঘরে যখন জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে ঢোকে তখন অন্য

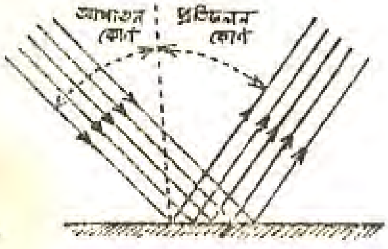


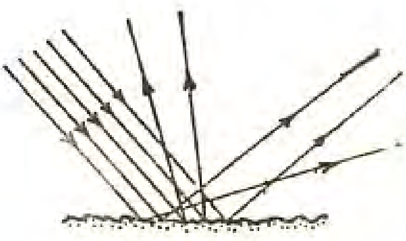

দরজা জানালা বন্ধ করে শুধু সেই একটা জানালা দিয়েই অল্প একটু রোদকে ঘরে ঢুকতে দাও। এবারে প্রথমে রোদটাকে একটা আয়না দিয়ে প্রতিফলিত কর, দেখবে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে চলে যাবে, ঘরটা বিশেষ আলোকিত হবে না। অমসৃণ পৃষ্ঠে প্রতিফলন পরীক্ষা করার জন্যে রোদটাকে একটা সাদা কাগজ বা সাদা কাপড়ে এসে পড়তে দাও, দেখবে সারা ঘর আলোকিত হয়ে উঠবে। এবারে আলো প্রতিফলিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বলে এ রকম হচ্ছে।

আলোর প্রতিফলনের মত সহজ জিনিস ব্যবহার করেই বেশ কিছু মজার জিনিস তৈরি করা যায়। প্রথমেই বলতে হয় পেরিস্কোপের কথা। সাবমেরিন যখন সমুদ্রে পানির নিচে দিয়ে যেতে থাকে তখন সমুদ্রের উপরে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখার জন্যে পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। তোমরা ফুটবল খেলার মাঠে খুব ভিড়ের জন্যে সামনে যেতে না পারলে পেছনে বসেই পেরিস্কোপ দিয়ে খেলা দেখতে পারবে। একটা লম্বা বাক্সের ভেতরে দুটি আয়না এমনভাবে রাখতে হয় (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) যেন আলো উপরের আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে নিচের আয়নায় এসে আবার প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখে এসে পড়ে। বাক্সে ঠিক উপরের আয়নার সামনে একটা বড় ফুটো রাখতে হবে আলো প্রবেশ করার জন্যে, আবার নিচের আয়নার সামনে একটা ফুটো রাখতে হবে দেখার জন্যে। যে যত বুদ্ধি খাটিয়ে বাক্সটা যত লম্বা করে তৈরি করতে পারবে সে তত উঁচু জায়গার জিনিস দেখতে পারবে। পেরিস্কোপ তৈরি করার সময়ে তোমরা নিজেরাই দেখবে আয়না দুটি বাক্সের দেয়ালের সাথে ঠিক ৪৫ ডিগ্রি (অর্ধ সমকোণ) কোণ করে রাখলেই এটা দিয়ে দেখা সম্ভব হবে। এর কারণ, আলোর প্রতিফলনের পরে প্রতিফলন কোণ (পরবর্তী ছবি) সব সময়ে আপাতন কোণের সমান হয়। কাজেই আয়না দুটি ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে থাকলে দুটি আয়নাতেই প্রতিফলন হওয়া সম্ভব, বাক্সটি যত লম্বা বা ছোটই হোক না কেন।

পেরিস্কোপ থেকেও সহজ যে জিনিসটি তৈরি করা হচ্ছে সেটি ক্যালিডাইস্কোপ। নাম শুনে ঘাবড়ে যেও না, ক্যালিডাইস্কোপ মানে আর কিছুই নয়, তিনটি সরু আয়না বা কাঁচ দিয়ে ত্রিভুজাকৃতি একটি নলের মত তৈরি করা। তিনটি কাঁচকে একটি কাপড় বা অন্যকিছু অস্বচ্ছ জিনিস দিয়ে মুড়ে নিতে হবে। এবারে একপাশের খোলা মুখ পাতলা কাগজ দিয়ে বন্ধ করে নিয়ে সেটার ভিতর একটি দুটি রঙিন কাঁচের টুকরো ফেলে দাও। যে দিকটি

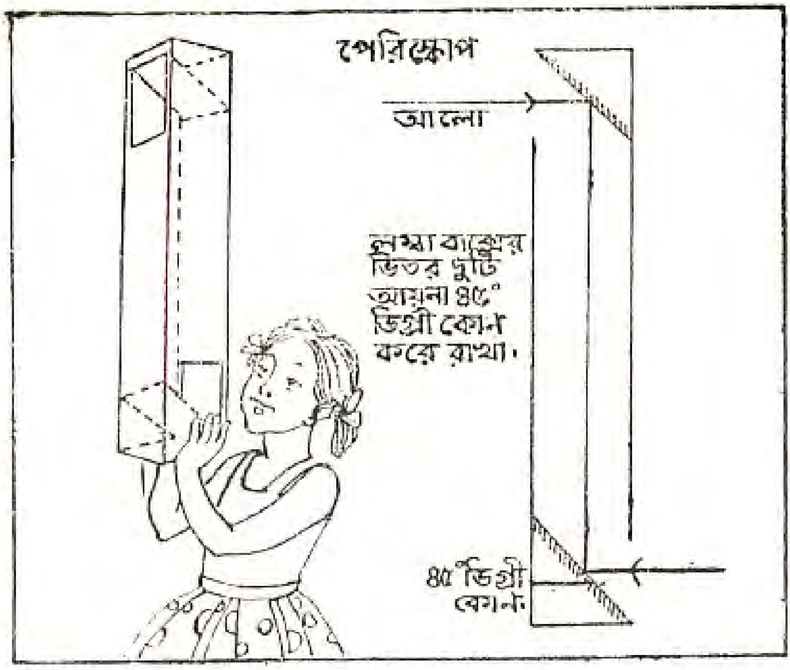
পেরিস্কোপ
আলো
লম্বা বাক্সের ভিতর দুটি আয়না ৪৫° ডিগ্রী কোন করে রাখা।
৪৫° ডিগ্রী কোন

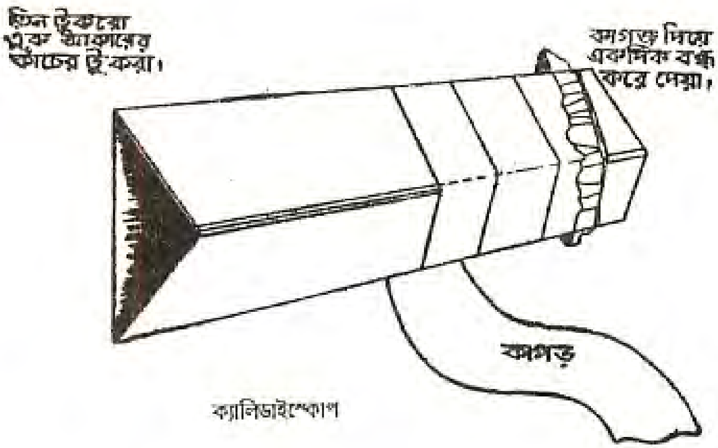
তিন টুকরো একই আকারের কাঁচের টুকরো।
কাগজ দিয়ে একদিক বন্ধ করে দেয়া।
কাগজ

ক্যালিডাইস্কোপ

খোলা আছে সেদিকে চোখ লাগিয়ে ভিতরে তাকালে অপূর্ব নক্সা দেখা যাবে। সবচেয়ে মজা হয় যখন তুমি তোমার ক্যালিডাইস্কোপ ঘুরাতে থাকবে আর ভিতরের নক্সা ঘুরে ঘুরে নূতন নূতন নক্সা তৈরি করতে থাকবে। তিনটি কাঁচ ভিতরে আয়নার মত কাজ করে। ভিতরে যে কোন জিনিস পাশাপাশি আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে অনেকগুলি হয়ে যায়, সেগুলি ত্রিভুজাকৃতি কাঁচগুলির কোনায় কোনায় দেখা দিয়ে এই অপূর্ব নক্সার তৈরি করে। এই ক্যালিডাইস্কোপ একটি আদি খেলনা। মানুষ বহুদিন থেকে এটি দেখে আসছে, তবু এটি এখনো পুরানো হয়নি।

## প্রতিসরণ

যদিও আমরা এতক্ষণ শুধু প্রতিফলনের কথা বলেছি, কিন্তু আসলে আলো যখনই এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে এসে পড়ে তখন প্রতিফলনের সাথে সাথে প্রতিসরণ এবং অল্প কিছু বিশোষণ হয়ে থাকে। প্রতিসরণের অর্থ হচ্ছে পার হয়ে যাওয়া, আর বিশোষণের অর্থ শোষিত হয়ে কিছু পরিমাণ আলো কমে যাওয়া। আলো যখন স্বচ্ছ কিছুতে এসে পড়ে তখন প্রতিসারিত হয় বেশি, প্রতিফলিত হয় অল্প, বিশোষিত হয় আরো অল্প। আবার

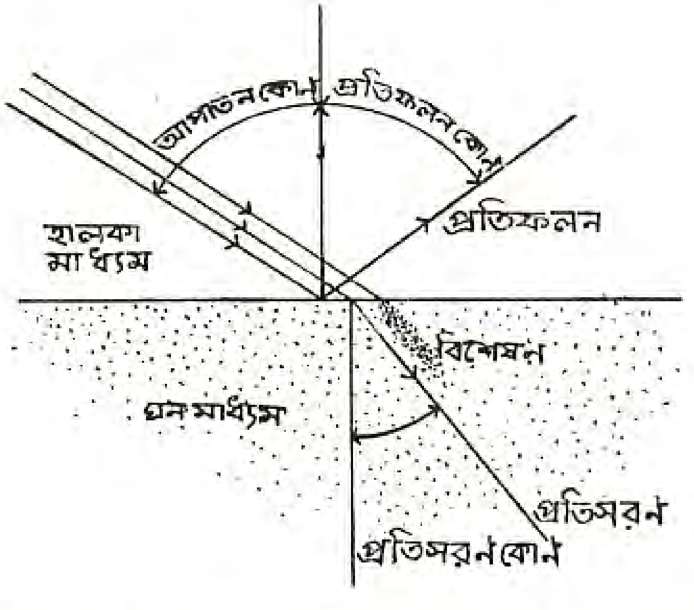


আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় সব সময়েই প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং বিশোষণ হয়ে থাকে

ভাল আয়নাতে প্রায় পুরোটাই প্রতিফলিত হয়ে যায়, প্রতিসারিত বা বিশোষিত হয় খুব কম। কুচকুচে কালো জিনিসে প্রতিফলন বা প্রতিসরণ প্রায় একেবারেই হয় না, প্রায় পুরোটাই বিশোষিত হয়ে যায়। আমরা সাধারণত ধরে নেব আলোর মাধ্যমগুলি খুব স্বচ্ছ, অর্থাৎ এগুলিতে খুব প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ হয়, বিশোষণ প্রায় না হবার মতই।

একই মাধ্যমে আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ একই সাথে হয়ে থাকে সেটি ব্যবহার করে একটি মজার পরীক্ষা করা সম্ভব। এক গ্লাস পানির সামনে একটা কাঁচ সোজা করে রাখ, গ্লাসটাকে কাঁচের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাবে। এবারে কাঁচের সামনে একটা মোমবাতি ধরলে মোমবাতিটার প্রতিফলন হবে কাঁচের উপরে। মোমবাতিটা একটু নাড়াচাড়া করে এমন এক জায়গায় রাখ যেন গ্লাস এবং মোমবাতিটা একই জায়গায় দেখা যায়। ঘরটা মোটামুটি অন্ধকার করতে পারলে মনে হবে মোমবাতিটা পানি ভর্তি গ্লাসের ভেতরে জ্বলছে! (নিচের ছবি দ্রষ্টব্য)।

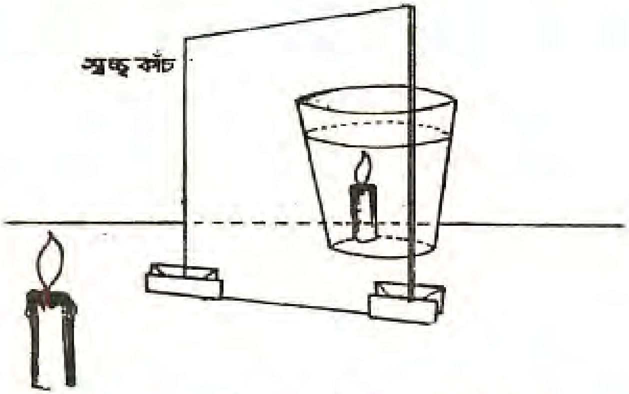


পানির ভিতর জ্বলন্ত মোমবাতি, একই সঙ্গে প্রতিফলন ও প্রতিসরণ

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার সময়ে বেঁকে যায়। যারা ঠিক বুঝতে পারনি যে আলো বেঁকে গেছে তারা নিশ্চয়ই অন্তত আলো বেঁকে যাবার ফলাফলটা লক্ষ্য করেছ। পানিতে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয় পা অসম্ভব খাটো হয়ে গেছে, কিংবা পানিতে লাঠি ডুবিয়ে দিলে মনে হয় লাঠিটা হঠাৎ করে বাঁকা হয়ে গেছে। এ সবই আলো বেঁকে যাওয়ার ফলাফল। একেবারে সহজভাবে ব্যাপারটা পরীক্ষা করা সম্ভব। একটা অস্বচ্ছ গ্লাস কিংবা কাপ নিয়ে তার ভিতরে একটা পয়সা ফেল। এখন কাপটা টেবিলের উপর রেখে আস্তে আস্তে পেছনে সরে গিয়ে এমন এক জায়গায় দাঁড়াও যখন ঠিক পয়সাটা আর দেখা যাচ্ছে না। এবারে কাউকে বল কাপটা না সরিয়ে খানিকটা পানি ঢেলে ভরে দিতে। দেখবে ( পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি ) পানি ভরার সাথে সাথে পয়সাটা দেখা যাচ্ছে। আলো বেঁকে এসে চোখে পড়ছে বলে যদিও পয়সাটা দেখার কথা নয় তবু দেখা যাচ্ছে। তবে পয়সাটা ঠিক যেখানে আছে সেখানে দেখা না গিয়ে একটু উপরে দেখা যাবে, কারণ চোখের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় আলোটা বেঁকে

খালি কাপে যে পয়সাটি দেখা অসম্ভব, পানি ভরে নেওয়ায় প্রতিসরণের ফলে আলো বেঁকে যাওয়ায় সেটি দেখা সম্ভব হতে পারে

আসছে। কাজেই আলো বেঁকে যাবার পর যেদিক থেকে আসছিল ঠিক সেখানেই পয়সাটা রয়েছে মনে হবে। এবারে তোমরা নিজেরাই ভেবে বের করতে পারবে পানিতে ডোবানো লাঠিকে কেন বাঁকা মনে হয় কিংবা দাঁড়ানো মানুষকে কেন খাটো মনে হয়।

শুধু যে পানিতে যাবার সময় আলো বেঁকে যায় সেটি কিন্তু সত্যি নয়, যে কোন মাধ্যমে যাবার সময় আলো বেঁকে যায়। তোমরা কাঁচ বা অন্য কোন তরল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার। কিন্তু এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় আলো বেঁকে যায় কেন? অনেকেই হয়তো ভাবছো সেটাই নিয়ম। হয়তো সেটাই নিয়ম, কিন্তু তারও একটা কারণ আছে। আমরা আগে বলেছি আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। কিন্তু যে জিনিসটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি সেটা হচ্ছে আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যখন সেটাকে কাঁচ, পানি এমন কি বাতাসের মত মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যেতে হয় তখন তার গতিবেগ খানিকটা কমে যায়। যে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাবার সময় গতিবেগ বেশি কমে যায় তাকে বলে ঘন মাধ্যম এবং যে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাবার সময় গতিবেগ খুব অল্প পরিমাণে কমে তাকে বলে হালকা মাধ্যম। বিভিন্ন মাধ্যমের গুণাবলী জানার জন্যে প্রতিসারাঙ্ক বলে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়। আলোর প্রকৃত গতিবেগ সেই মাধ্যমের ভিতর আলোর কমে যাওয়া গতিবেগ থেকে কতগুণ বেশি সেটিকেই বলা হয় প্রতিসারাঙ্ক। যেমন পানির প্রতিরাঙ্ক ১·৩, তার অর্থ হচ্ছে পানিতে আলোর গতিবেগ একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলের ১·৩ ভাগ (১৮৬০০০÷১·৩ =১৪৩০৭৭)। তেমনি হীরার প্রতিসারাঙ্ক ২·৫ তার অর্থ হচ্ছে হীরার ভিতরে আলোর গতিবেগ তার প্রকৃত গতিবেগ আড়াই ভাগের এক ভাগ। বাতাসের প্রতিসারাঙ্ক ১·০০৩। সেটি খুব কাছাকাছি। তাই এটি ধরে নেয়া খুব বেশি ভুল নয় যে বাতাসে আলোর গতিবেগের খুব পরিবর্তন হয় না।

যাই হোক আমরা আলো কেন এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যাবার সময় বেঁকে যায় সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। সেটা বোঝা সবচেয়ে সহজ হয় যদি আমরা একটা আলোর বীমকে কল্পনা করে নিই এক দল সৈন্য (নিচের ছবি)। তারা সারি সারি এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক তাদের পথের মাঝখানে খানিকটা জায়গা খুব খারাপ, কাজেই সেখানে অনেক আস্তে সাবধানে এগোতে হয়। সৈন্যদল যদি খারাপ রাস্তাটুকুতেও তাদের সারি বজায় রাখতে চায় তাহলে তাদের একটু বেঁকে যেতেই হবে। কারণ যারা আগে খারাপ রাস্তায় ঢুকেছে তারা অনেক আস্তে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু একই সারির অন্যেরা যারা তখনো খারাপ অংশটুকুতে ঢোকেনি তারা একই সময়ে তাদের স্বাভাবিক গতিতে

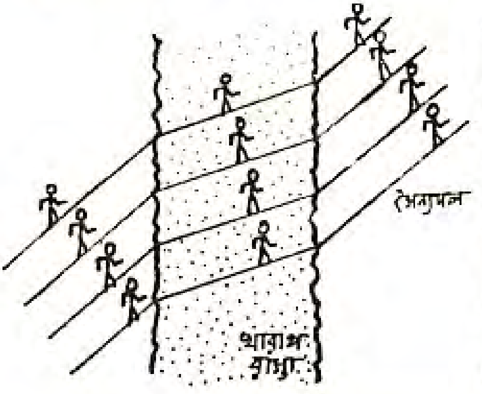

অনেকটুকু এগিয়ে গেছে। কাজেই সারির এক অংশ অন্য অংশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। সৈন্যদলের সবাই যদি একটু ঘুরে যায় তাহলেই আবার নূতন করে সারি তৈরি করা সম্ভব। খারাপ রাস্তাটা থেকে বের হবার সময়ে আবার ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটা ঘটবে। কাজেই তখন সারি বজায় রাখার জন্যে পুরো সৈন্যদলটাকে উল্টো দিকে ঘুরে যেতে হবে। এবারে সৈন্যদলের জায়গায় আলো এবং খারাপ রাস্তার জায়গায় একটা ভিন্ন মাধ্যম (পানি বা কাঁচ) কল্পনা করে নাও। ভিন্ন মাধ্যমে আলোর গতিবেগ কম, তাই আলোর শীর্ষ একই রেখায় থাকার জন্যে আলোকে বেঁকে যেতে হয়। সৈন্যদলের উদাহরণের সাথে আলোর প্রতিসরণের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই, দুটো ঠিক একই ব্যাপার।

এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় আলো কতটুকু বেঁকে যাবে তা নির্ভর করে আলোর প্রতিসারাঙ্কের উপর। সোজা করে বলা যায় যে মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক যত বেশি সেখানে প্রবেশ করার সময় আলো তত বেশি বেঁকে যায়। প্রায় সব জিনিসের প্রতিসারাঙ্কই বিজ্ঞানীরা মেপে বের করে রেখেছেন। ইচ্ছে করলে তোমরাও মেপে দেখতে পার। প্রতিসারাঙ্ক বের করার জন্যে আসলে আলোর গতিবেগ মাপার দরকার হয় না, আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় কতটুকু বেঁকে গেছে জানলেই হয়। একটা চওড়া কাঁচ বা অন্য কোন স্বচ্ছ জিনিস পেলে তোমরা সহজেই তার প্রতিসারাঙ্ক

বের করতে পারবে। প্রথমে সেটিকে একটা সাদা কাগজের উপর রেখে চারদিকে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে নাও, যেন পরে কাঁচের টুকরোটি সরিয়ে নিলেও তুমি জানতে পার ঠিক কোথায় টুকরোটি ছিল। এখন একটি পিন ঠিক কাঁচ ঘেঁষে কাগজে গেঁথে দাও যেন সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, ধরা যাক এটি ১ নং পিন (নিচের ছবি)। এবারে ২ নং পিনটিকে বেশ

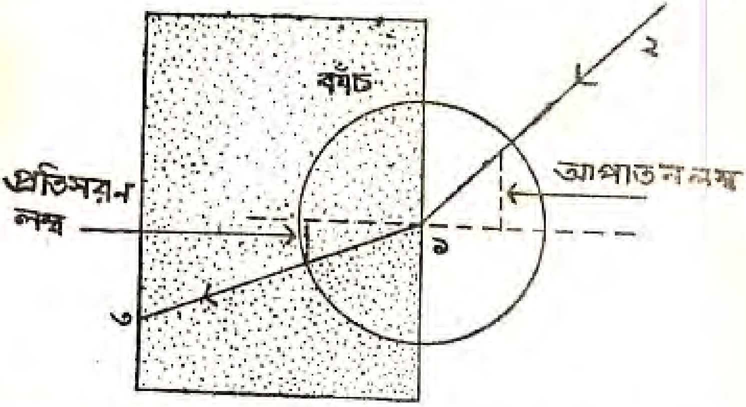


একটু দূরে এবং এক পাশে গেঁথে দাও। এখন কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে তুমি ৩ নং পিনটিকে কাঁচের গাঁ ঘেঁষে এমন এক জায়গায় গেঁথে দাও যেন মনে হয় ২ নং, ১ নং এবং ৩ নং পিনটি ঠিক একই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। মনে রেখো কাঁচের উপর দিয়ে তাকালে কিন্তু দেখবে পিন তিনটি মোটেই এক লাইনে দাঁড়িয়ে নেই, শুধুমাত্র কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালে দেখা যাবে পিন তিনটি এক লাইনে। এবারে কাঁচের টুকরো এবং পিন তিনটি সাবধানে সরিয়ে নিয়ে ১, ২ ও ৩ নং পিনের জায়গায় তিনটি বিন্দু এঁকে নাও। এখন স্কেল দিয়ে ১ ও ২ নং বিন্দু যোগ করে একটি সরলরেখা আঁক। তারপর ১ ও ৩ নং বিন্দু যোগ করে আরেকটি সরল রেখা আঁক। এই রেখাটির দিকে তাকালেই তোমরা দেখবে আলো ঠিক কিভাবে বেঁকে গিয়েছে। প্রতিসারাঙ্ক বের করতে হলে এখন তোমাকে ১ নং বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বড়সড় বৃত্ত আঁকতে হবে। এরপরে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে স্কেল দিয়ে আপাতন লম্ব এবং প্রতিসরণ লম্ব সাবধানে মেপে নাও। আপাতন লম্বকে প্রতিসরণ লম্ব দিয়ে ভাগ করলেই কাঁচের প্রতিসারাঙ্ক বেরিয়ে পড়বে। পুরো পরীক্ষাটি আরেকবার আরেকটু অন্যভাবে করো তাহলে আপাতন লম্ব এবং প্রতিসরণ লম্বের দৈর্ঘ্য অন্যরকম হবে। কিন্তু আপাতন লম্বকে প্রতিসরণ লম্বের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল একই হবে—কারণ প্রতিসারাঙ্ক সব সময়েই এক। তোমরা যদি কাঁচের প্রতিসারাঙ্ক বের করো তাহলে সেটি ১·৫ এর কাছাকাছি হওয়া উচিত। যদি একটি চওড়া কাঁচ না পাও তাহলে বেশ কয়টি কাঁচকে পাশাপাশি একত্র করে চওড়া করে নিতে পার—সেটি প্রায় একই ব্যাপার হবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আলোর প্রতিসরণের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। গরমের দিনে দূরে মাটির দিকে তাকালে দেখা যায় মাটির কাছে সবকিছু থিরথির করে কাঁপছে।

গরমে মাটির কাছাকাছি বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। হালকা বাতাসের প্রতিসারাঙ্কও কম, তাই আলো উপরে উঠে যেতে থাকা গরম বাতাসের ভিতর দিয়ে আসার সময় নানা দিকে বেঁকে যায়। দেখে মনে হয় সবকিছু বুঝি থিরথির করে নড়ছে। মরুভূমিতে ঠিক একই কারণে মরীচিকা দেখা যায়। মাটির কাছাকাছি বাতাস গরম হয়ে থাকে। তাই দূর থেকে কোন গাছপালা দেখলে অনেক সময় গাছের নিচে আরেকটি প্রতিবিম্ব দেখা যায়, মনে হয় বুঝি গাছের নিচে পানিতে গাছের প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে। আসলে এই প্রতিবিম্বটি তৈরি হয় বেঁকে যাওয়া আলো দিয়ে। উপরের ঘন বাতাস থেকে হালকা বাতাসে আলো ঢোকার সময় আলো অনেক সময় এভাবে বেঁকে যায় (নিচের ছবি)।

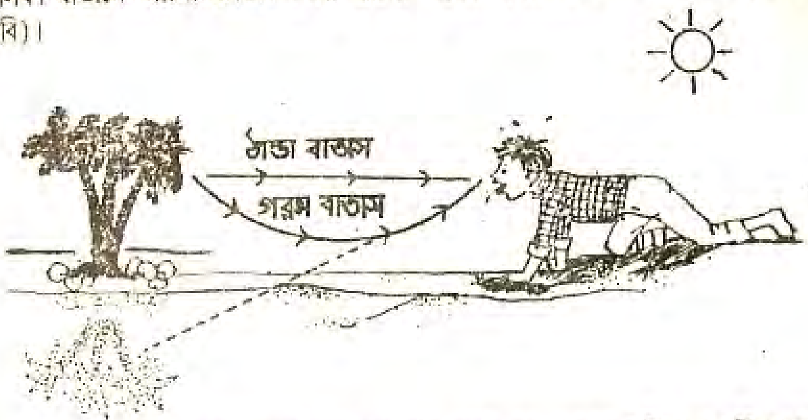


দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের প্রতিসারাঙ্ক যদি একই হয় তাহলে দুটিকে একটি থেকে অন্যটি আলাদা করা সম্ভব নয়। এটি ব্যবহার করে বেশ মজা করা সম্ভব, তবে তার জন্যে ট্রাইক্লোরোইথিলীন নামে একটি তরল পদার্থ এবং পাইরেক্স কাঁচ দরকার। ট্রাইক্লোরোইথিলীন নামটি যদিও অনেক বড় এবং জটিল, কিন্তু জিনিসটি খুব সাধারণ। স্কুলে তোমাদের স্যাররা সহজেই জোগাড় করে দিতে পারবেন। এক গ্লাস পানিতে এক টুকরো পাইরেক্স কাঁচ দিলে সেটি স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু এক গ্লাস ট্রাইক্লোরোইথিলীনে একটুকরো পাইরেক্স কাঁচ ডুবিয়ে দিলে সেটা একেবারে দেখা যায় না, মনে হয় পানিতে পুরোপুরি গলে গেছে। পাইরেক্স কাঁচ আর ট্রাইক্লোরোইথিলীনের প্রতিসারাঙ্ক সমান। তাই এ রকমটি হয়ে থাকে।

## বিশোষণ

আমরা এতক্ষণ আলোর বিশোষণ নিয়ে একটা কথাও বলিনি। বিশোষণের ফলে শুধু আলোর তীব্রতা খানিকটা কমে যায়, এছাড়া আলোর ব্যবহারের অন্য কোন পরিবর্তন হয় না। আলোর বিশোষণ কিন্তু সবসময়েই হয়ে থাকে, কখনো বেশি আর কখনো কম। আমরা চারদিকে এত যে চমৎকার রঙয়ের ছড়াছড়ি দেখি তার পেছনেও রয়েছে আলোর বিশোষণ। একটি জিনিসের একটি নির্দিষ্ট রঙ থাকার অর্থ সে জিনিসটি শুধু ঐ রঙয়ের

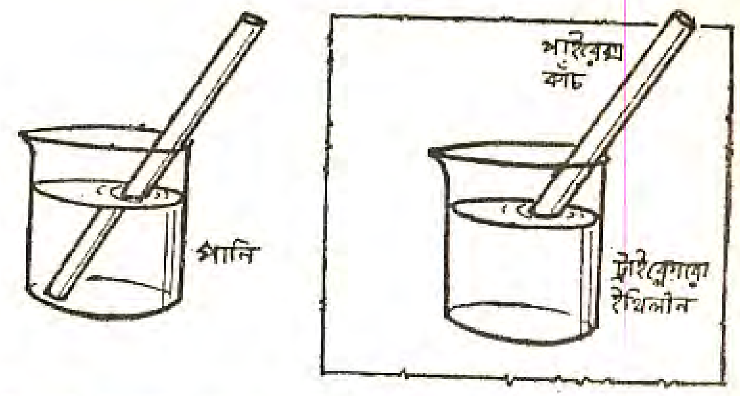


আলোকে প্রতিফলিত করে, অন্য সব রঙকে বিশোষণ করে নেয়। রঙ নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা সেটা আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব।

তোমরা অনেকেই হয়তো জান আলো এক ধরনের শক্তি। শক্তির কোন ক্ষয় নেই, সেটা সব সময়েই কোন না কোনভাবে থেকে যায়। তাই যদি কখনো কোন কিছুতে আলোর বিশোষণ হয় তাহলে সে জিনিসটির শক্তি বেড়ে যাওয়া উচিত। আসলেই তাই হয়, আলোর বিশোষণ হলে জিনিসটি গরম হয়ে ওঠে! খুব সহজভাবে সেটা পরীক্ষা করতে পারবে, একটা কালো জিনিস আরেকটা সাদা জিনিস খানিকক্ষণ রোদে রেখে দিলে দেখবে কালো জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে উঠবে। তার কারণ হচ্ছে কালো জিনিস সব আলোই বিশোষণ করে নেয়, কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। তাই আলোর পুরোশক্তিটাই তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সাদা জিনিসে আলো প্রায় পুরোটাই প্রতিফলিত হয়ে যায়, বলতে গেলে কিছুই বিশোষিত হয় না, তাই সাদা জিনিস সহজে গরম হয়ে ওঠে না। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কেন ট্রাফিক পুলিস সবসময় সাদা কাপড় পরে থাকে। ঠিক একই কারণে ক্রিকেট খেলার সময় সাদা কাপড় পরা হয়, রোদে দীর্ঘ সময় থাকতে হলে সাদা কাপড় পরা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

আলো থেকে শুধু যে তাপ শক্তিই পাওয়া সম্ভব সেটি ঠিক নয়, অন্য যে কোন ধরনের শক্তিও পাওয়া যেতে পারে। ফটোসেল নামের একধরনের জিনিসে আলো পড়তেই সেটি বিদ্যুতের সৃষ্টি করে। আলো থেকে রাসায়নিক শক্তি পাবার সবচেয়ে সহজ উদাহরণ ক্যামেরার ফিল্ম। আলো পড়ামাত্রই একটা বিশেষ রাসায়নিক ব্যাপার ঘটতে থাকে, যা থেকে শেষ পর্যন্ত ছবি তোলা সম্ভব হয়। আলো থেকে গতিশক্তিও পাওয়া সম্ভব। প্রথম প্রথম মহাকাশে যেসব উপগ্রহ পাঠানো হয়েছিল সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে গিয়েছিল। কারণ সূর্যের আলো উপগ্রহগুলিকে প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। সেই একই কারণে ধূমকেতুর লেজ, সবসময়ে সূর্যের উল্টো (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) দিকে থাকে। সূর্যের আলোর চাপ ধূমকেতুর লেজকে সূর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কখনো যদি তোমাদের ধূমকেতু দেখার সৌভাগ্য হয় তাহলে সাথে সাথেই বলতে পারবে সূর্যটা কোথায় আছে।

যদিও তোমাদের শক্তির রূপান্তরের বেশ কয়টি উদাহরণ দেয়া হল তবু মনে রেখো আলোর বিশোষণ দিয়ে সবচেয়ে বেশি যে শক্তিটি পাওয়া সম্ভব সেটি হচ্ছে তাপ শক্তি। শুধু আলো থেকে নয়, অন্য যে কোন শক্তি থেকে তাপ শক্তি সবচেয়ে সহজে পাওয়া যায়, এমনকি আমরা না চাইলেও খানিকটা শক্তি তাপ শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। এই ধরনের তাপশক্তিকে বলতে পারো শক্তির অপচয়। কোন ধরনের শক্তি না চাইতেই তাপ শক্তি হিসেবে বের হয়ে গেলে সেটা ফিরে পাওয়া খুব কঠিন। শক্তির ধ্বংস নেই, কিন্তু একবার তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলে সেটা প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবার মতোই, কারণ সেটাকে আর আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ইলেকট্রিক বাল্বের কাজ আলো দেয়া, কিন্তু এটা সাথে সাথে গরমও হয়ে ওঠে। গরমটা কোন কাজে লাগে না, সেটা অপচয়। তাই বের করা হয়েছে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, সেটা থেকে কোন তাপ বের হয় না, শুধু আলো বের হয়, তাই তাতে বিদ্যুৎ খরচ হয় খুব কম। যদিও মানুষ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে অনেক কিছুই তৈরি করেছে, কিন্তু মানুষের তৈরি শ্রেষ্ঠ যন্ত্রও গাছের একটা ছোট সবুজ পাতার কাছে হার মেনে যাবে! একটি ছোট পাতা আলোকে যত নিপুণ ভাবে ব্যবহার করে সেই শক্তিটা দিয়ে তার খাবার তৈরি করে, পৃথিবীর বর্তমান প্রকৌশল বিদ্যা সেটি এখনো কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না! বলতে পার প্রকৌশল বিদ্যার আসল লক্ষ্য সেটিই, গাছের পাতার মত শক্তিকে অপচয় না করে ব্যবহার করা!

## পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

স্বচ্ছ জিনিস বলতে আমরা বোঝাই যার ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে। কিন্তু এমন কি হতে পারে যে একেবারে স্বচ্ছ জিনিস অথচ তার ভিতর দিয়ে আলো একটুও যেতে পারছে না, উল্টো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে? যদিও ব্যাপারটি অসম্ভব মনে হচ্ছে কিন্তু

আসলে সত্যি তাই হতে পারে। কেন হতে পারে এখুনি বুঝতে পারবে। আমরা আগেই বলেছি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ঢোকার সময় আলো বেঁকে যায়। আলোটা ঠিক কিভাবে বেঁকে যায় সেটাও জানা দরকার। আলো যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন (নিচের ছবি) সবসময়ে প্রতিসরণ কোন আপাতন কোণ থেকে ছোট হয়ে থাকে। কতটুকু ছোট তা নির্ভর করে মাধ্যম দুটির প্রতিসারাঙ্কের উপর। কাজেই এই ক্ষেত্রে আপাতন কোণ যত বড় কিংবা যত ছোটই হোক না কেন আলো সবসময়েই ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু আলো যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন ব্যাপারটি তা নয়, কারণ এবারে প্রতিসরণ কোণটি হবে আপাতন কোণ থেকেও

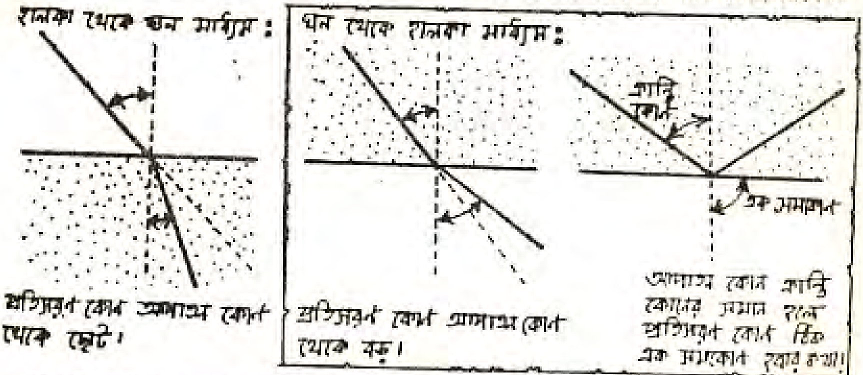


বড়। কাজেই আপাতন কোণটিকে যদি বড় করতে থাকা যায় প্রতিসরণ কোণটি হবে আরো অনেক বেশি বড় এবং একসময়ে প্রতিসরণ কোণটি এত বড় হবে যে আলোক রশ্মিকে ঘন মাধ্যমের গা ঘেঁষে বের হতে হবে! আলো গা ঘেঁষে অবশ্য বের হয় না, তখন পুরোটাই প্রতিফলিত হয়ে যায়। ঠিক যে আপাতন কোণের বেশি হলে আলো পুরোটাই প্রতিফলিত হয়ে যায় তার নাম ক্রান্তি কোণ। মনে রেখো, আলো যখনই এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন খানিকটা কিন্তু সবসময়েই প্রতিফলিত হয়। আপাতন কোণ যখন ক্রান্তি কোণের সমান কিংবা বেশি হয় তখন খানিকটা না হয়ে পুরোটাই প্রতিফলিত হয়ে যায়। আলোর এই ধরনের প্রতিফলনের নাম পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন। কাজেই দেখতে পারছ দুটি স্বচ্ছ মাধ্যম পাশাপাশি থাকলেই যে একটা থেকে আরেকটাতে যেতে পারবে সেটা সবসময়ে সত্যি নয়। ঘন মাধ্যম থেকে আলো হালকা মাধ্যমে যেতে পারে যখন আপাতন কোণ ক্রান্তি কোণ থেকে কম হয়।

আলোর এই ধর্ম ব্যবহার করে মজার মজার পরীক্ষা করা সম্ভব। সবচেয়ে সহজ হচ্ছে রূপার ডিম তৈরি করা! একটা ডিমকে মোমবাতির শিখায় ধরে খুব ভাল করে কালি লাগিয়ে নিয়ে এক গ্লাস পানিতে ছেড়ে দাও। দেখবে পুরো ডিমটাকে কালো না দেখিয়ে দেখাচ্ছে চকচকে রূপার মত। ডিমটাকে মোমবাতির শিখায় কালো করায় ডিমের উপর সূক্ষ্ম কালো অঙ্গারের একটা আবরণ পড়ে, শুধু তাই নয় তার মাঝে মাঝে বাতাস আটকে থাকে। তাই ডিমটাকে যখন পানিতে ডোবানো হয় ডিমের চারপাশে বাতাসের সূক্ষ্ম একটা আবরণ রয়ে যায়। আলো যখন পানি থেকে সেই বাতাসের আবরণের ভেতর দিয়ে যেতে

চেষ্টা করে বেশির ভাগই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে প্রতিফলিত হয়ে বেরিয়ে আসে, ফলে ডিমটি আয়নার মত চকচক করতে থাকে, মনে হয় বুঝি রূপার ডিম। এই পরীক্ষাটি যে তোমাদের ডিম দিয়েই করতে হবে তেমন কোন কথা নেই, পানিতে ডুবে থাকে এরকম যে কোন জিনিস দিয়েই করতে পার।

আলোর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনকে ব্যবহার করে আজকাল আরো অনেক ধরনের কাজ করা সম্ভব। কাঁচ জাতীয় জিনিস দিয়ে খুব সূক্ষ্ম সুতার মত তৈরি করা যায়। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্যে এই কাঁচের সূক্ষ্ম সুতা থেকে আলো বের হতে পারে না। একসাথে এরকম অনেকগুলো সুতা একত্র করে সেটিকে একটি নল হিসেবে ব্যবহার করা যায়, এমন কি এই নল দিয়ে একটি আস্ত ছবিকে অবিকৃত অবস্থায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়া সম্ভব। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই নলকে বাঁকানো সম্ভব এবং তাতেও ছবির কোন ক্ষতি হয় না।

তোমরা ঘরে বসে এই ধরনের কিছু করতে না পারলেও এর কাছাকাছি একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। এক মুখ খোলা টিনের একটা কৌটা নিয়ে তার নিচে সাবধানে একটা ছোট ফুটো কর যেন টিনটি পানি দিয়ে ভরে নিলে ঐ ফুটো দিয়ে পানি বের হতে পারে। এবারে টিনটি পানি ভরে একটু কাত করে ধরে (নিচের ছবি) টিনটির খোলা মুখে একটা টর্চলাইট জ্বালিয়ে দাও। যদি একটি অন্ধকার ঘরে টর্চলাইট এবং টিনের কৌটা দুটিই

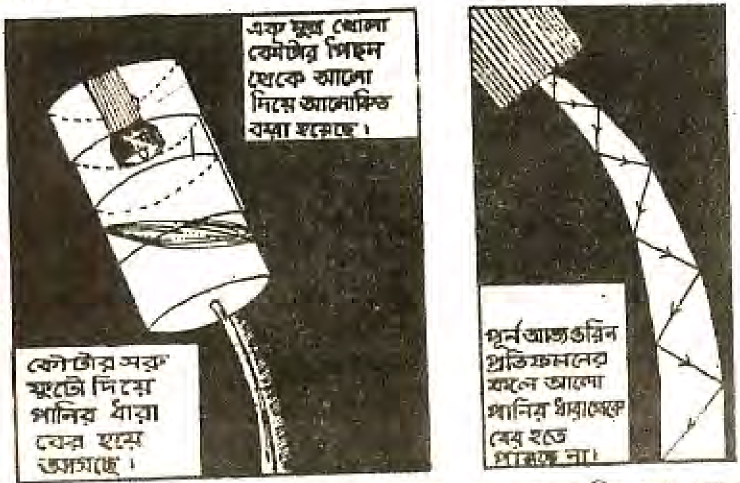


পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য পানির ধারাকে আলোর ধারা মনে হচ্ছে

কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে নিতে পার তাহলে কৌটা থেকে যে পানির ধারা বের হচ্ছে সেটিকে মনে হবে একটা আলোর ধারা! পানি বাঁকা হয়ে যেখানে পড়ছে সেখানে হাত দাও দেখবে হাতে আলো এসে পড়ছে। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে এই পানির ধারা থেকেও আলো সহজে বের হতে পারে না, অল্প যেটুকু বের হয় তাতেই এই পানির ধারাকে মনে হয় আলোর ধারা! আলোকে তুমি বাঁকাতে পার বলে বন্ধুদের এই পরীক্ষাটি দেখিয়ে অবাক করে দিতে পার।

মাছের কাছে পৃথিবীটা কেমন দেখায় তোমরা কখনো ভেবে দেখেছ? পানির নিচে ডুব

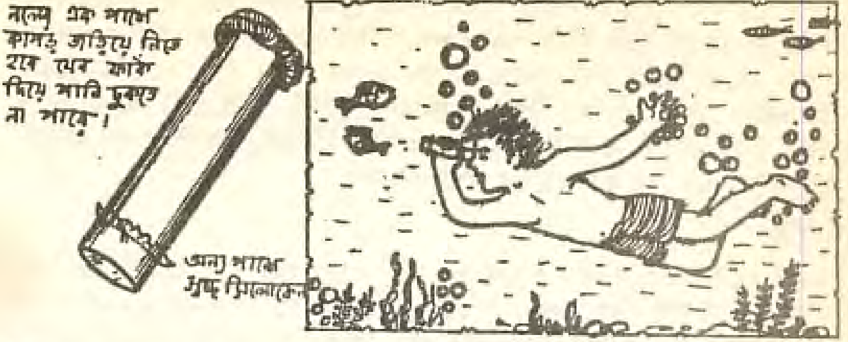


দিয়ে তোমরা যারা দেখার চেষ্টা করেছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ সেখানে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। মাছের চোখ একটু বিশষভাবে তৈরি বলে তারা কিন্তু সব স্পষ্ট দেখতে পারে। ডুবুরীরাও চোখে বিশেষ ধরনের চশমা পড়ে পানির নিচে যায় বলে তারাও মাছের মত সেখানে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পারে। ডুবুরীর চশমা বা সাঁতারের চশমা জোগাড় করা সবার জন্যে সম্ভব নয়। তাই তোমরা যদি নিজেরা সে ধরনের একটা কিছু তৈরি করে নিতে পার তাহলে তোমরাও পানির নিচে দেখতে পাবে। আসল ব্যাপারটা খুবই সহজ, শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চোখে কিছুতেই পানি না লাগে। একটা বাঁশ বা প্লাস্টিকের নলের সামনে স্বচ্ছ পলিথিন জাতীয় কিছু ভালভাবে আটকে নিতে পারলেই (উপরের ছবি) হয়ে গেল। পানির তলায় সেটি চোখে দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে, তবে চোখের ফাঁক দিয়ে পানি ঢুকতে পারে বলে নলটির অন্য পাশে একটু কাপড় পেঁচিয়ে লাগিয়ে নেয়া ভাল। পানির নিচে বেশিক্ষণ থাকলে ভিতরে পানি ঢুকে যেতে পারে, তখন উপরে ওঠে শুকিয়ে নিয়ে আবার শুরু করতে পারবে।

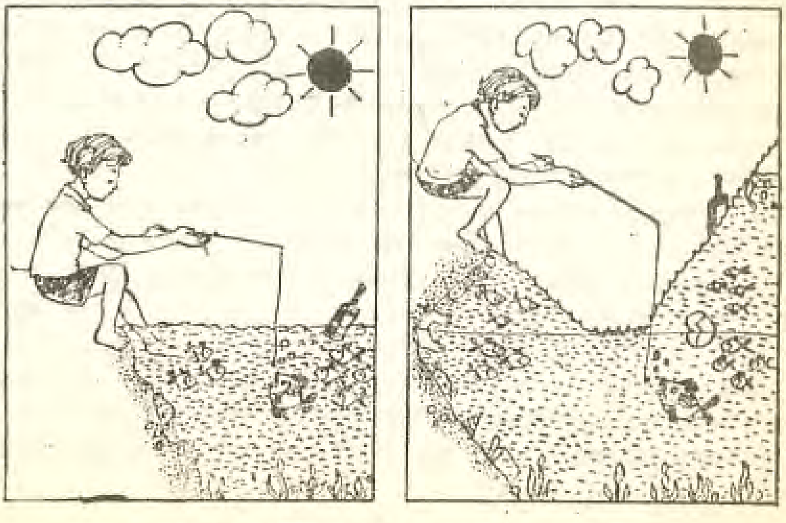

বাম পাশের ছবিটির মাছের চোখ দেখাবে ডানপাশের ছবির মত

তোমরা যারা পুকুর বা নদীতে গোসল করার সুযোগ পাও তারা যদি পানির নিচে দেখার এই চশমাটি তৈরি করতে পার তাহলে পানিতে মাছ, গাছপালা, শাপলা, শালুক, কাঁকড়া ছাড়াও আরো একটা মজার জিনিস দেখতে পাবে। সেটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্যে পানির নিচের জিনিসকে (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ছবি) পানির উপরে দেখা। ছবিতে কোনটি কি জন্যে দেখা যাচ্ছে তা আর বলে দেয়া হল না, তোমরা এটাকে ধাঁধা হিসেবে ধরে নিয়ে নিজেরাই বের করার চেষ্টা কর।

## লেন্স

তোমরা সবাই কখনো না কখনো নিশ্চয়ই লেন্স দেখেছ। যারা অন্য কোন ধরনের লেন্স দেখনি তারা নিশ্চয়ই চশমা দেখেছ, চশমার কাঁচ তো এক ধরনের লেন্স ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু চশমা নয়, ক্যামেরা, টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ প্রজেক্টর বা যে কোন জিনিসে যেখানে আলোকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতে হয় সব জায়গাতেই লেন্সের প্রয়োজন। আলোর এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় বেঁকে যাওয়ার ধর্মকে ব্যবহার করে লেন্স তৈরি করা হয়েছে। লেন্সকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, উত্তল লেন্স এবং অবতল লেন্স। খুব সহজভাবে বলতে চাইলে বলা যায় উত্তল লেন্স দিয়ে দেখলে একটা জিনিসকে বড় দেখায়, আর অবতল লেন্স দিয়ে দেখলে সেটিকে দেখায় ছোট। বেশি সহজভাবে বললে সব সময়েই কথাটি পুরোপুরি ঠিকভাবে বলা যায় না, এবারেও তাই হয়েছে। উত্তল লেন্স দিয়ে একটা জিনিসকে বড় দেখা যায় সত্যি, কিন্তু লেন্সটি চোখ থেকে অনেক দূরে ধরে অনেক দূর থেকে দেখলে সে জিনিসটিকে উল্টো, এমন কি ছোটও দেখা যেতে পারে। কিন্তু অবতল লেন্স দিয়ে কাছের বা দূরের সব জিনিসই ছোট দেখায়, লেন্সটি চোখের কাছে কিংবা চোখ থেকে দূরে রাখলেও কোন পার্থক্য হয় না। লেন্স কিভাবে কাজ করে জানার পর তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে কেন এরকম হয়। তাই যদি কখনো কোন লেন্স পরীক্ষা করে দেখতে চাও তাহলে সেটি দিয়ে খুব কাছের জিনিস পরীক্ষা করবে, যদি বড় দেখা যায় সেটি উত্তল লেন্স—যত বেশি বড় দেখাবে সে লেন্সের পাওয়ার তত বেশি। আর যদি জিনিসটি ছোট দেখা যায় তাহলে সেটি হবে অবতল লেন্স এবং যত বেশি ছোট দেখাবে সেই অবতল লেন্সটির পাওয়ার তত বেশি। তোমার নিজের কিংবা তোমার বাসার আর কারো চশমা থাকলে এখনি পরীক্ষা করে দেখতে পার কোনটি কি ধরনের লেন্স দিয়ে তৈরি। দেখবে বেশির ভাগ সময়েই বয়স্ক লোকদের চশমা উত্তল লেন্স দিয়ে তৈরি হয় আর কম বয়সীদের চশমা তৈরি হয় অবতল লেন্স দিয়ে।

আমরা আগেই বলেছি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলো প্রবেশ করার সময় বেঁকে যাবার ধর্মকে ব্যবহার করে লেন্স তৈরি করা হয়। উত্তল লেন্সে আলোকে এক বিন্দুতে এনে মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। অবতল লেন্সে ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটা ঘটে, সেখানে আলোকে ছড়িয়ে দেয়ার (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) চেষ্টা করা হয়। একটি সমান্তরাল আলোর বীম একটি উত্তল লেন্সের ভিতর দিয়ে গেলে সেটি যেটুকু দূরে গিয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয় সেটিকে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব। বুঝতেই পারছ আলো ফোকাস দূরত্বে একবিন্দুতে মিলিত হবার পর সেটা আবার ছড়িয়ে পড়ে। অবতল লেন্সে আলো সবসময়েই ছড়িয়ে পড়ে। তাই অনেকেই মনে করতে পার তার বুঝি কোন ফোকাস

উত্তল লেন্স:

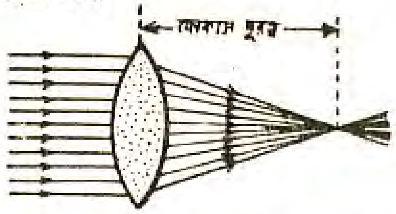


অবতল লেন্স:

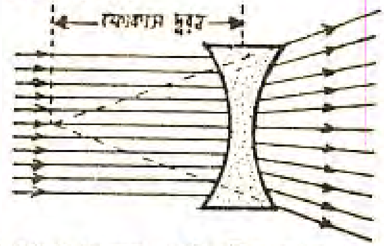


দূরত্ব নেই। কিন্তু অবতল লেন্সের ছড়িয়ে পড়া আলো আসলে একটা বিন্দু থেকে বের হয়ে আসছে, তাহলে সেই বিন্দু থেকে অবতল লেন্সটির দূরত্বকে বলা হবে সেটির ফোকাস দূরত্ব। যে লেন্সের পাওয়ার যত বেশি তার ফোকাস দূরত্ব তত কম। কেউ যদি বলে তার চশমার পাওয়ার ২ তার অর্থ হচ্ছে তার চশমার লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ১÷২ = ·৫ মিটার (এক মিটার হচ্ছে এক গজ তিন ইঞ্চির কাছাকাছি)। আবার কেউ যদি বলে তার চশমার লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ৪ মিটার তাহলে বুঝতে হবে সেটির পাওয়ার ১÷৪ = ·২৫। কাজেই বুঝতে পারছ ফোকাস দূরত্ব দিয়ে ১ কে ভাগ দিলে লেন্সের পাওয়ার বের হয়, আবার পাওয়ার দিয়ে ১ কে ভাগ দিলে ফোকাস দূরত্ব বের হয়। তবে দুবারই ফোকাস দূরত্ব বের হয় মিটারে, আজকাল গজ ফুট ইঞ্চির পরিবর্তে পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই মিটার, কিলোমিটার সেন্টিমিটার, ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অনেক সময়ে একটি লেন্সের ভিতর দিয়ে না তাকিয়ে শুধু সেটাকে দেখেই বলে দেয়া সম্ভব সেটি উত্তল লেন্স না অবতল লেন্স। উত্তল লেন্সের মাঝখানের অংশটুকু তুলনামূলকভাবে অন্য অংশ থেকে পুরু হয়। অবতল লেন্সের বেলায় হয় ঠিক তার উল্টো (পরবর্তী পৃষ্ঠার উপরের ছবি)। অবতল লেন্সের মাঝখানের অংশটুকু তুলনামূলক ভাবে সরু। একটি সাধারণ চশমার কাঁচ পরীক্ষা করে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে তুলনামূলকভাবে বলতে কি বোঝানো হচ্ছে।

একবার যদি জেনে যাও লেন্সের ভিতর দিয়ে আলো যাবার সময়ে কি হয় তাহলে কেন উত্তল লেন্স দিয়ে বড় এবং অবতল লেন্স দিয়ে ছোট দেখা যায় বোঝা খুব সহজ। ধরা যাক, তুমি উত্তল লেন্স দিয়ে কাছের জিনিস দেখছ, অর্থাৎ জিনিসটা ফোকাস দূরত্বের ভিতরে রয়েছে। জিনিসটি থেকে আলো গিয়ে লেন্সের উপরে (পরবর্তী পৃষ্ঠার নিচের ছবি) পড়বে। ধরা যাক ছবিতে দেখানো মোমবাতিটির ঠিক মাথা থেকে আলো মাটির সমান্তরালভাবে গিয়ে লেন্সে পড়ছে। আমরা জানি সেটা ফোকাস বিন্দুর ভিতর দিয়ে যাবে। আবার মোমবাতির সেই একই বিন্দু থেকে আলো সোজা লেন্সের ঠিক মাঝখানে এসে পড়লে সেটি প্রায় না বেঁকেই সোজা বেরিয়ে যাবে (কারণ ঠিক মাঝখানটায় দুই পৃষ্ঠই প্রায় সমান্তরাল এবং এমন কিছু বেশি রকম চওড়াও নয়)। কেউ যদি এখন অন্য পাশ থেকে মোমবাতিটা দেখার চেষ্টা করে তার কাছে মনে হবে আলোকরশ্মি দুটি আসছে পেছনের অন্য একটি বিন্দু থেকে, রশ্মি দুটিকে সোজা পেছন দিকে বাড়িয়ে দিলে যেখানে ছেদ করবে সেখান থেকে। মোমবাতির প্রত্যেকটা বিন্দুই ঠিক একইভাবে মনে হবে পেছনে অন্য একটি জায়গা থেকে আসছে, যার ফলে পুরো মোমবাতিটি দেখাবে অনেক বড়। ঠিক

একইভাবে অবতল লেন্সে এর উল্টো ব্যাপারটি ঘটে, ফলে জিনিসটা দেখা যায় ছোটো, ছবি দেখলেই সেটা বুঝতে পারবে। উত্তল লেন্সে জিনিসটি বড় দেখানোর জন্যে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের ভিতরে রাখতে হয়। অবতল লেন্সে সেরকম কোন নিয়ম নেই, যে কোন জায়গাতেই রাখা যায় এবং সবসময়েই এটা ছোট দেখায়।

বিভিন্ন রকমের উত্তল ও অবতল লেন্স

উত্তল লেন্সে কোন জিনিস ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখলে কি হয়? ঠিক আগের মত (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে একটি আলোকরশ্মি ফোকাস বিন্দুর ভিতর দিয়ে যাবে, আরেকটি ঠিক লেন্সের মাঝখান দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে। এবারে মোমবাতিটি ফোকাস দূরত্ব থেকে বাইরে থাকায় আলোকরশ্মি দুটি আগেরবারের মত ছড়িয়ে যাবে না, বরং সত্যি সত্যি এক বিন্দুতে মিলিত হবে। মোমবাতির প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে আলো এইভাবে এসে নূতন জায়গায় তার প্রতিবিম্ব তৈরি করে। তাই কেউ তাকালে সেটিকে এই নূতন জায়গায় উল্টোভাবে দেখতে পাবে। আগেরবারের থেকে এবারে একটি খুব বড় পার্থক্য রয়েছে—আগে মনে হতো আলোকরশ্মিগুলি যেন অন্য জায়গা থেকে আসছে। এবারে প্রতিবিম্বটি যেখানে দেখা যাচ্ছে সত্যি সত্যি সেখানে আলোগুলি এসে মিলিত হয়েছে। এমনকি সেখানে একটা সাদা কাগজ ধরলে সত্যি সত্যি কাগজে স্পষ্ট একটা উল্টো প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। তুমি দিনের বেলায় ঘরের ভিতরে খোলা জানালার বিপরীত দিকে দেয়ালের কাছে একটা উত্তল লেন্স ধরে একটু সামনে পিছে নাড়লেই দেয়ালে জানালার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। এভাবে খুব সহজে উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বের করা যায়, কারণ দূরের জিনিসের

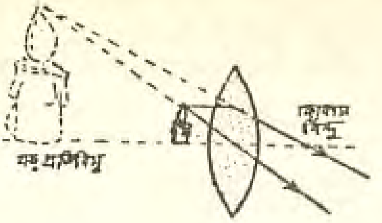


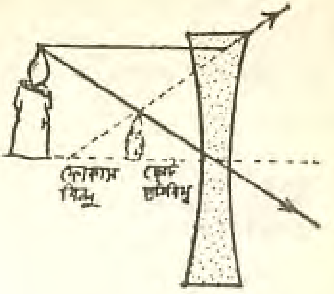


প্রতিবিম্ব সবসময়ে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের কাছাকাছি তৈরি হয়। কাজেই উত্তল লেন্স থেকে দূরের কোন জিনিসের প্রতিবিম্বের দূরত্বই হচ্ছে তার ফোকাস দূরত্ব। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব মাপার এরকম সহজ কোন উপায় নেই।

দেখতেই পাচ্ছ লেন্স খুব মজার জিনিস। চশমার দোকানে ঘোরানো লেন্স হয়তো বেশ অল্প দামে কেনা সম্ভব। তোমরা নিজেরাও লেন্স তৈরি করতে পার, তবে সেগুলো হবে সাময়িক, আর সেগুলো ব্যবহার করে আরো মজার জিনিস তৈরি করা খুবই কঠিন। সবচেয়ে সহজে লেন্স তৈরি করা যায় পানির ফোঁটা দিয়ে। তার পেঁচিয়ে পানির ফোঁটার সমান একটা ছোট গোল আংটির মত তৈরি করে সেটাতে (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) সাবধানে দু এক ফোঁটা পানি রাখতে পারলেই সেটা একটা লেন্স হয়ে যাবে। অল্প পানি হলে সেটি হবে অবতল লেন্স, সাবধানে আরো কয়েক ফোঁটা পানি বসিয়ে দিতে পারলে সেটি হয়ে যাবে উত্তল লেন্স। প্লাস্টিক বা রাংতাতে সুঁই দিয়ে ছোট ফুটো করে তার উপরে পানির ফোঁটা বসিয়েও লেন্স তৈরি করা সম্ভব। এই লেন্সগুলোর সমস্যা হচ্ছে এগুলো খুব ছোট ফোকাস, দূরত্ব খুব কম। তা ছাড়া পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায় বেশ তাড়াতাড়ি। পানির বদলে গ্লিসারিন ব্যবহার করলে বাষ্পীভূত হওয়ার সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

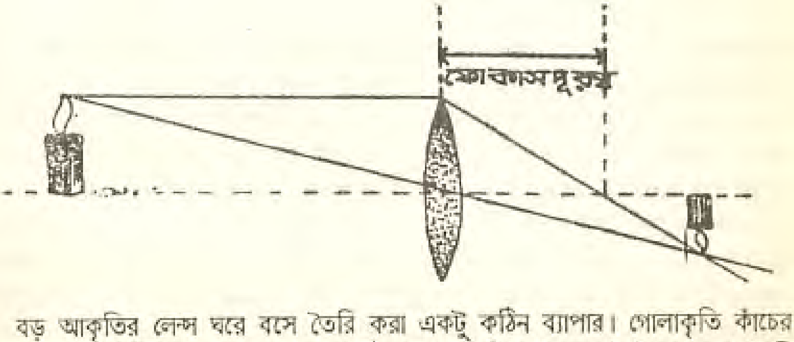


বড় আকৃতির লেন্স ঘরে বসে তৈরি করা একটু কঠিন ব্যাপার। গোলাকৃতি কাঁচের কোন ফ্লাস্কে পানি ভরে খুব কম ফোকাস দূরত্বের (বেশি পাওয়ারের) উত্তল লেন্স তৈরি করা সম্ভব। পুরানো বাল্বের গোড়াটা সাবধানে খুলে নিলে সেটা প্রায় গোলাকৃতির কাঁচের

পানি ব্যবহার করে লেন্স তৈরি করা সম্ভব

নানাকিছু পরীক্ষা করে দেখতে পার। মনে রেখ, পৃথিবীর প্রথম মাইক্রোস্কোপ তৈরি হয়েছিল পানির ফোঁটা দিয়ে। আর যদি কয়েকটি লেন্স জোগাড় করতে পার তাহলে নিচের জিনিসগুলি তৈরি করতে পারবে। ঠিক কত পাওয়ারের কত বড় লেন্স কিভাবে লাগাতে হবে তার খুঁটিনাটি ইচ্ছা করেই বলে দেয়া হল না, তোমরা তৈরি করার সময় নিজেরাই বুঝতে পারবে।

## লেন্সের ব্যবহার

টেলিস্কোপ ঃ একটি খুব বেশি পাওয়ারের আরেকটি খুব অল্প পাওয়ারের উত্তল লেন্স দিয়ে টেলিস্কোপ তৈরি করা যায়। এই টেলিস্কোপ দিয়ে সবকিছু উল্টো দেখা যায় বলে সাধারণত গ্রহ নক্ষত্র দেখার জন্যে ব্যবহার করা হয়, তাই এর নাম নভো টেলিস্কোপ। নভো টেলিস্কোপে লম্বায় যে দুটি লেন্স ব্যবহার করা হয় তাদের ফোকাস দৈর্ঘ্যের যোগফলের কাছাকাছি হয়ে থাকে। নভো টেলিস্কোপ তৈরি করতে হলে প্রথমে দুটি নল তৈরি বা জোগাড় করে নাও যেন একটার ভিতর দিয়ে আরেকটা বেশ সহজে যেতে আসতে পারে। এবারে মোটা নলটির সামনে অল্প পাওয়ারের লেন্সটি বুদ্ধি করে আটকে নাও—এটিকে এখন বলা হবে অভিলক্ষ্য লেন্স। এটি আকারে যত বড় হবে ততই ভাল। লক্ষ্য রেখো যেন অভিলক্ষ্য লেন্সের পাওয়ার খুব কম না হয়ে যায়, তাহলে ফোকাস দৈর্ঘ্য এত বেশি হয়ে যাবে যে সেই রকম বড় নল জোগাড় করা মুশকিল হয়ে পড়বে।

এবারে সরু নলটির অন্যপাশে নিচের বেশি পাওয়ারের লেন্সটি লাগিয়ে নাও, এর নাম অভিনেত্র লেন্স। অভিনেত্র লেন্সের আকার অভিলক্ষ্য লেন্সের মত বড় আকারের হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এখন মোটা নলটির ভেতরে সরু নলটি ঢুকিয়ে অভিনেত্র লেন্সে চোখ লাগিয়ে দূরের কোন জিনিসের দিকে তাকাও। মোটা নলটি একটু সামনে পেছনে করে

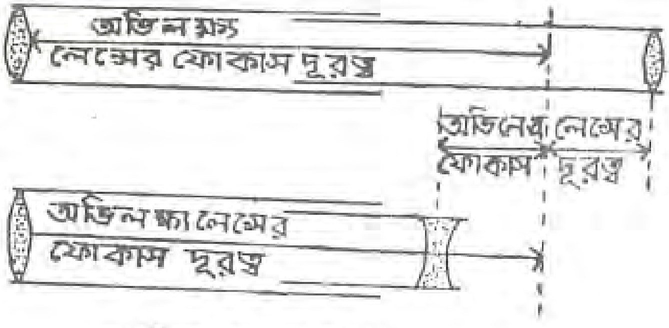


নভো টেলিস্কোপ ও সাধারণ টেলিস্কোপ

ফোকাস করে নিলেই দূরের জিনিস খুব কাছে এবং খুব স্পষ্ট দেখতে পাবে তবে উল্টোভাবে।

সোজাভাবে দেখার জন্যে আসলে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। বেশি পাওয়ারের উত্তল লেন্সটি বদলে যদি বেশি পাওয়ারের অবতল লেন্সকে অভিনেত্র লেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলেই সবকিছু সোজাভাবে দেখা যাবে। এই টেলিস্কোপের আরেকটি সুবিধা হচ্ছে যে এটি লম্বায় দুটি লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যের যোগফল না হয়ে বিয়োগফল হয়ে থাকে, তাই এটি নভো টেলিস্কোপ থেকে লম্বায় ছোট।

**প্রজেক্টর ঃ** সিনেমা বা স্লাইড দেখানোর সময় যে জিনিসটি ব্যবহার করে ছোট ছবিকে অনেক বড় করে পর্দায় দেখানো হয় সেটির নাম প্রজেক্টর। তোমরা ইচ্ছা করলে প্রজেক্টর তৈরি করতে পার তাতে অবশ্যি শুধু স্থির ছবি দেখানো সম্ভব হবে। প্রজেক্টর ফিল্মের পেছন থেকে কোন ধরনের প্রখর আলো দেয়ার ব্যবস্থা করে ফিল্মটির সামনে মোটামুটি ফোকাস দূরত্বে একটি (বা দুটি) বেশি পাওয়ারের উত্তল লেন্স রাখা হয়। ফলে সামনে দেয়ালে ফিল্মটির একটি উল্টো প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রতিবিম্বটি সোজা দেখানোর জন্য প্রজেক্টরে ফিল্মটি উল্টো করে বসাতে হয়। পুরো জিনিসটি একটা বাক্সের ভেতর (নিচের ছবির মত) রাখা উচিত যেন কোন দিক দিয়ে আলো বের হতে না পারে।

প্রজেক্টরে ছবি দেখানোর আগে ঘর অন্ধকার করে নিতে হয় আর মোটামুটি কাছে থেকে দেখানো সবচেয়ে ভাল, তাতে ছবিটা হয়তো খুব বড় হবে না কিন্তু খুব স্পষ্ট দেখা যাবে। আয়না দিয়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। ইচ্ছে করলে ভাল টর্চলাইট ব্যবহার করতে পার। যারা ইলেকট্রিক ল্যাম্প ব্যবহার করতে চাও তারা সবসময়ে বড়দেরকে বলে করবে। ইলেকট্রিক বাল্ব খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে। বাল্বটি

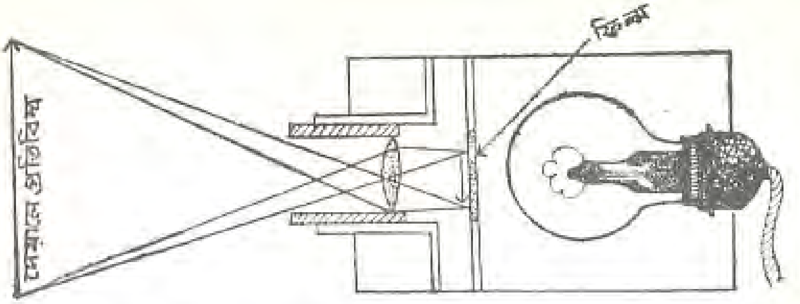


পুড়িয়ে পর্যন্ত ফেলতে পারে, কাজেই সবসময়েই কম ওয়াটের বাল্ব ব্যবহার করা উচিত।

**ক্যামেরা ঃ** আগেই বলে রাখছি এই ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু ছবি তোলা সম্ভব নয়, শুধু ক্যামেরা কিভাবে কাজ করে তার একটা ধারণা হবে। পিনহোল ক্যামেরা কিভাবে তৈরি করা হয় (নিচের ছবি) আগেও বলা হয়েছে। ঠিক সেভাবেই সবকিছু তৈরি করে সমান সরু ফুটোর জায়গায় একটি বেশি পাওয়ারের উত্তল লেন্স লাগিয়ে নিলেই সেটি ক্যামেরার মত

কাজ করবে। পিনহোল ক্যামেরায় অর্ধ স্বচ্ছ পর্দা যত দূরেই থাকুক বেশ স্পষ্ট একটা প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। এই ক্যামেরায় পেছনের অর্ধ স্বচ্ছ পর্দার দূরত্ব ঠিক না হলে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি হবে না।

**দিয়াশলাই ঃ** উত্তল লেন্স দিয়ে দিয়াশলাইয়ের কাজ করা সম্ভব, অবশ্যি যখন সূর্যের আলো থাকবে তখন। লেন্সটি রোদে ধরলে লেন্সের ফোকাস বিন্দুতে আলো এসে মিলিত হয়ে সেখানে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি করবে। ওখানে শুকনো কাগজ রাখলে কিছুক্ষণের মাঝেই আগুন ধরে যায়। কখনো হাত দিয়ে দেখতে যেয়ো না কতটা গরম। আরো একটি ব্যাপার, কখনো কোন ধরনের লেন্স দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে যেয়ো না সূর্যটা কেমন দেখায়, তোমার চোখের পুরোপুরি সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

# আলো ও তরঙ্গ

আলো সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক কিছুই বলা হয়েছে, এমন কি আলো ব্যবহার করে কিভাবে নানা ধরনের মজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব সে সম্পর্কে আলোচনা ছেড়ে দেয়া হয়নি। এখন কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে আলো জিনিসটা কি তুমি কি বলবে? আমরা সবাই আলো দেখে এত অভ্যস্ত যে অনেকের কাছে মনে হতে পারে এটা আবার একটা প্রশ্ন হতে পারে নাকি, আমরা যা দেখি তাই হচ্ছে আলো। কথাটি সত্যি। কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তর কি এই কথাটি দিয়ে দেয়া সম্ভব? তাই এবারে একটু অন্যভাবে প্রশ্ন করা যায়, আলো হলেই সেটা কি দেখা যাবে? তোমরা যারা অবলাল আলো বা অতিবেগুনী আলোর কথা শুনেছ তারা জান এই ধরনের আলো দেখা যায় না। যারা এই দুধরনের আলোর কথা শোননি তারা নিশ্চয়ই এক্সরে-র কথা শুনেছ যা দিয়ে হাত-পা ভেঙে গেলে ভাঙা হাড়ের ছবি তোলা হয়। যদিও এক্সরে খালি চোখে দেখা যায় না এবং শরীরের ভেতর দিয়ে এক্সরে সহজেই চলে যেতে পারে তবুও এক্সরে হচ্ছে এক ধরনের আলো। (জার্মানীর বিজ্ঞানী রন্টজেন প্রথম যখন হঠাৎ করে এই অদৃশ্য আলো তৈরি করেছিলেন তিনি সেটাকে বুঝতে না পেরে নাম দিয়েছিলেন এক্স রে।) আমরা যে আলো দেখি তার সাথে এই অদৃশ্য আলোগুলোর কোন মৌলিক পার্থক্য নেই; লাল আলোর সাথে নীল আলোর যতটুকু পার্থক্য, দৃশ্যমান আলোর সাথে অদৃশ্য আলোর পার্থক্য তার থেকে একটুও বেশি নয়। কাজেই বুঝতেই পারছ আলোটা আসলে ঠিক কি জিনিস সেটা আমাদের জানা দরকার।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল নামের একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী একশো বছরের আগেও তার সুবিখ্যাত ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ লিখেছিলেন। সেই থেকে সবাই জানতে পেরেছিল আলো হচ্ছে তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ। তাড়িত কথাটি এসেছে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ থেকে। তোমরা সবাই সেটার সাথে কম বেশি পরিচিত। চৌম্বক কথাটির অর্থ হচ্ছে চুম্বক সম্বন্ধীয়, আর চুম্বক চেনে না সেরকম লোক পৃথিবীতে মনে হয় একটিও নেই। কাজেই নাম থেকেই বুঝতে

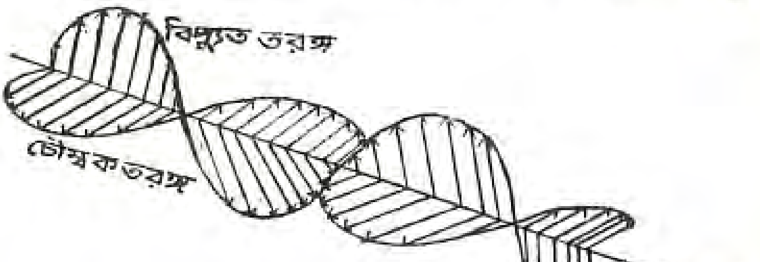


পারছ আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চুম্বক সম্পর্কিত এক ধরনের তরঙ্গ। আসলেই যে আলো আমরা দেখি এবং যে সব আলো আমাদের চোখে অদৃশ্য এর সবই হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের উপরের এক ধরনের তরঙ্গ।

তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই পুরো ব্যাপারটি ভাল করে বুঝতে পারনি। কিন্তু এজন্যে ঘাবড়ে যেও না। তাড়িত ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের ধারণা হতে একটু সময় দরকার কাজেই আপাতত শুধু 'তাড়িত চুম্বক ক্ষেত্রের' নামটা মনে রেখো, আর যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, যে আলো হচ্ছে এক ধরনের তরঙ্গ—এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি ভাল করে জেনে রেখো। তোমরা দেখে অবাক হয়ে যাবে; আলো হচ্ছে এক ধরনের তরঙ্গ এই কথাটি একবার বিশ্বাস করে নিলে কত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। যদিও এখন অতি সহজে আমরা বলে দিতে পারি আলো হচ্ছে এক ধরনের তরঙ্গ কিন্তু সেটি এক সময়ে এত সহজ ব্যাপার ছিল না। নিউটনের মত বড় বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন আলো হচ্ছে এক ধরনের কণা দিয়ে তৈরি, কাজেই তখন ফ্রেনেল, ইয়ং, ফ্রাউনহফার এদের অনেক কষ্ট করে একসময়ে প্রমাণ করতে হয়েছে যে আসলে আলো হচ্ছে তরঙ্গ। সেটি কি ধরনের তরঙ্গ বের করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল আরো অনেক পরে।

এবারে তরঙ্গ ব্যাপারটি সম্পর্কে একটা ধারণা করা দরকার। আলোর তরঙ্গ খুবই ছোট। কাজেই আমাদের সহজ একটা তরঙ্গ নিয়ে শুরু করা উচিত যেটি চোখে দেখা সম্ভব। সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে পানির তরঙ্গ। পৃথিবীর সব তরঙ্গের ধর্ম এক। কাজেই পানির তরঙ্গ থেকে আমরা যেসব জিনিস শিখব তার সবকিছুই আলোর তরঙ্গের বেলায় সত্যি হবে। পানির তরঙ্গ তৈরি করার জন্যে একটা বালতি বা অন্য বড় একটা পাত্র পানি ভরে নিয়ে বসো। পানিটাকে স্থির হবার জন্য একটু সময় দাও। তারপর একটা আঙুল দিয়ে আস্তে পানিটাকে স্পর্শ করো। দেখবে আঙুলটাকে কেন্দ্র করে একটা গোল তরঙ্গের বৃত্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে (ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে, তরঙ্গের বৃত্তটি বালতির দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরেও আসছে!)। শান্ত পুকুরে একটা মাছ লাফ দিয়ে উঠলে কিংবা ঢিল ছুঁড়ে দিলেও সেই একই ব্যাপার দেখা যায়। যেখানেই তরঙ্গটা সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করার মত তা হচ্ছে, পানিতে তরঙ্গের বেগ সব সময়েই সমান। তুমি বালতির পানি আস্তে আঙুল দিয়ে স্পর্শ কর কিংবা জোরে টোকা দাও—প্রত্যেক বারই তরঙ্গের বৃত্তটি বালতির কিনারা পর্যন্ত পৌঁছাতে একই সময় নেবে। তেমনি পুকুরে একটা ছোট ঢিল মারলে তরঙ্গের উচ্চতা বা বিস্তার কম হবে, আবার বড় একটি ঢিল মারলে বিস্তার বেশি হবে, কিন্তু তরঙ্গ দুবারই ঠিক একই বেগে ছড়িয়ে যাবে। আগেই বলা হয়েছে যে-ব্যাপারটি পানির তরঙ্গের জন্য সত্যি সেটি আলোর তরঙ্গের জন্যেও সত্যি। আলোর তীব্রতা বেশি হোক কি কম হোক তার গতিবেগ সব সময়েই সমান। আলোর মত শব্দও এই ধরনের তরঙ্গ। বাতাসে শব্দের গতিবেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ১০৮৯ ফুট, এটিও সবসময়ে একই থাকে। জোরে চেঁচিয়ে হয়তো শব্দকে বেশি দূর থেকে শোনা সম্ভব কিন্তু কখনো বেশি তাড়াতাড়ি শোনা সম্ভব নয়।

তরঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে তার কম্পন। বালতির পানিতে টোকা দিয়ে তুমি যখন তরঙ্গের সৃষ্টি করছিলে তখন ইচ্ছা করলে তুমি প্রতি মিনিটে দশবার করে টোকা দিতে পারতে, কিংবা উৎসাহ বেশি হলে প্রতি মিনিটে একশবার করেও টোকা দিতে পারতে। দুবারই একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হতো, তবে প্রথমবার বলা হতো তরঙ্গের কম্পন হচ্ছে মিনিটে দশবার, দ্বিতীয়বার হচ্ছে মিনিটে একশবার। পানির তরঙ্গে কম্পন বেশি বা কম হলে কোন পার্থক্য হয় না, কিন্তু শব্দের বেলায় কম্পন বাড়ালে বা কমালে অভূতপূর্ব

ব্যাপার ঘটে থাকে। যেমন কেউ যদি একটা তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে যার কম্পন হচ্ছে সেকেণ্ডে ছয় কোটি কোটি (৬০০,০০০,০০০,০০০,০০০) তাহলে সেটি আসলে হবে সবুজ আলো! (ছয় কোটি কোটি এ টা বিরাট বড় সংখ্যা, এটিকে সহজ করে লেখা যায় $৬০০\times১০^{১২}$ বা ৬০০ টেরা।) এবারে যদি কোনভাবে কম্পন বাড়িয়ে দিয়ে সেকেণ্ডে ৬৬০ টেরা করে দেয়া যায় তবে সেটি হবে নীল আলো, যদি আরো বাড়িয়ে সেটি ৭৫০ টেরা করা হয় তবে সেটি হবে বেগুনী আলো। যদি কম্পন আরো বাড়াতে চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটি আর চোখে দেখা যাবে না। এই আলোর নাম অতি বেগুনী আলো। ঠিক একই ভাবে কেউ যদি ৬০০ টেরা (সবুজ আলোর কম্পন) থেকে শুরু করে কোনভাবে কমিয়ে কম্পন ৫০০ টেরা করতে পারে তাহলে সেই আলোর রঙ হবে কমলা, আরো কমিয়ে যদি কম্পন ৪৪০ টেরা করা যায় তাহলে সেটি হবে লাল আলো। কম্পন যদি

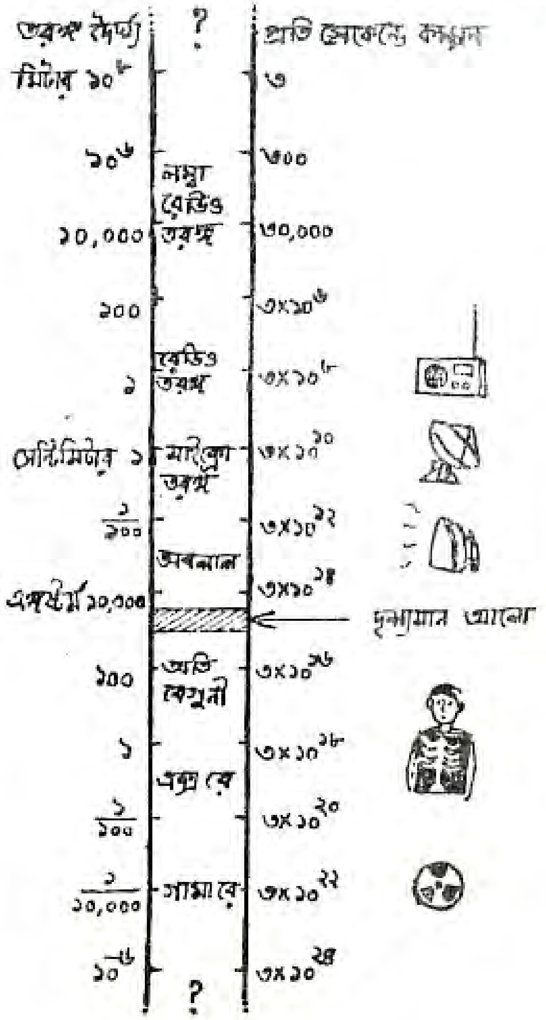

আরো কমিয়ে দেয়া সম্ভব হয় তাহলে সেই আলো আর খালি চোখে দেখা যাবে না, এই আলোর নাম অবলাল আলো। তোমরা যখন আগুন বা অন্য কোন গরম জিনিসের কাছে দাঁড়াও তখন যে তাপটা অনুভব কর কিন্তু দেখতে পার না, সেটিই হচ্ছে অবলাল আলো। কাজেই দেখতে পারছ কম্পন কি আশ্চর্য জিনিস, সেটি পরিবর্তন করে শুধু যে আলোর রঙ পরিবর্তন করা যায় তাই নয়, আলোকে অদৃশ্য পর্যন্ত করে ফেলা যায়। কম্পন যত বেশিই হোক আর যত কমই হোক না কেন এটি কিন্তু সবসময়েই তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ। সুবিধের জন্যে বিভিন্ন কম্পনের তরঙ্গের বিভিন্ন নাম (৩৩ নং পৃষ্ঠায়) দেয়া হয়েছে। বেতার তরঙ্গ, রাডার, তাপ, আলো, এক্সরে বা গামা রে-এর মত ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আসলে একই ব্যাপার। আমি বাজি রেখে বলতে পারি তোমরা যারা আগে এটি জানতে না তারা নিশ্চয়ই শুনে খুব অবাক হয়েছ!

আমরা আগেই দেখেছি তরঙ্গের বিস্তার বা বিস্তার কম হোক বা বেশি হোক তার বেগ সব সময়ই সমান থাকে। কম্পনের বেলাতেও তাই, কম্পন বেশি হোক আর কমই হোক তার বেগ সব সময়েই সমান। অর্থাৎ লাল আলো, সবুজ আলো, অবলাল আলো, এক্স-রে বা অন্য যে কোন ধরনের তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গই হোক না কেন সবগুলির বেগই সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। এটি সব ধরনের তরঙ্গের জন্যেই সত্যি। যদি দুটি ভিন্ন পানির পাত্রে দুজন দুটি ভিন্ন কম্পনের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে থাকে, একটু পরে দেখা যাবে দুটি তরঙ্গই ঠিক সমান দূরত্ব অতিক্রম করেছে, কারণ দুই ক্ষেত্রেই তরঙ্গের বেগ একই রয়েছে। কিন্তু যে পাত্রে কম্পন বেশি (নিচের ছবি) সেখানে বেশি সংখ্যক তরঙ্গ তৈরি হয়েছে। আর যে পাত্রে কম্পন কম সেখানে কম সংখ্যক তরঙ্গ তৈরি হয়েছে। কাজেই

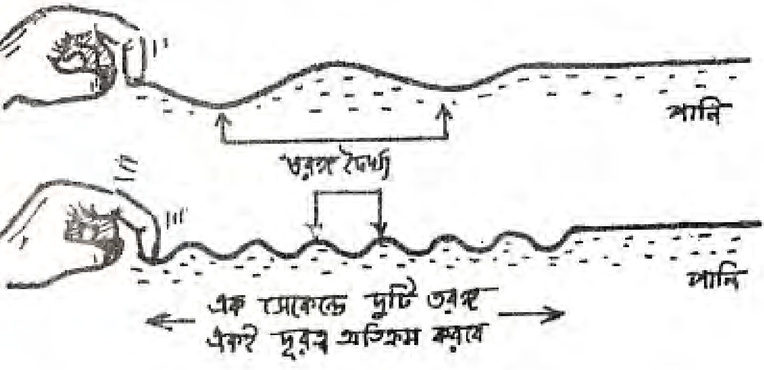


স্বাভাবিক ভাবেই তরঙ্গগুলো তুলনামূলকভাবে লম্বা। কাজেই দেখতে পাচ্ছ কম্পন বেশি হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হয়, তেমনি কম্পন কম হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লম্বা হয়। আসলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে কম্পন দিয়ে গুণ করে তরঙ্গের বেগ বের করা যায়। যেহেতু বেগ সব সময়েই সমান, তাই কম্পন জানা থাকলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সব সময়েই বের করা যায়। একটি নির্দিষ্ট তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রের কথা বলার সময় সেটির কম্পন কিংবা সেটির তরঙ্গ

দৈর্ঘ্য যে-কোন একটি বললেই হয়। আলোর ক্ষেত্রে কম্পন না বলে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কথা বলা সহজ। যেমন লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের একলক্ষভাগের একভাগ বা ৬০০০ অ্যাঙ্গস্ট্রম, তেমনি সবুজ আলো ৫০০০ অ্যাঙ্গস্ট্রম, বেগুনী আলো ৪০০০ অ্যাঙ্গস্ট্রম। কম্পন কম হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় বলে রেডিও তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক দুই মাইল পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

## বর্ণালী

আলো সত্যিই যে এক ধরনের তরঙ্গ সেটি বহুভাবে বহুবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আজকাল সেসব পরীক্ষা যে কেউ করে দেখতে পারে। যদিও বেশির ভাগ পরীক্ষাগুলো করার জন্যে কোন না কোন ধরনের বিশেষভাবে তৈরি যন্ত্রপাতির দরকার, তবুও একটি-দুটি জিনিস ঘরে বসে হাতের কাছের জিনিস নিয়েই করা সম্ভব। আমরা ধীরে ধীরে সেগুলোতেই আসছি। মনে রেখো এখন থেকে আলো বলতে বোঝাব, যে আলো আমরা দেখতে পাই।

প্রথমেই বলতে হয় বর্ণালীর কথা। সূর্যের আলোর যদিও কোন রঙ দেখা যায় না, আসলে সেখানে সব রঙই রয়েছে। চোখের পক্ষে অনেকগুলো রঙকে মিশিয়ে দিলে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়, তাই সূর্যের আলোতে যে সবগুলো রঙ রয়েছে সেটা আমরা কখনো বুঝতে পারি না। তবে কোনভাবে রঙগুলোকে আলাদা করে দিতে পারলে আর কারো সন্দেহ থাকবে না। ব্যাপারটি খুব কঠিন নয়, তবে তার আগে আরেকটি ব্যাপার জানা দরকার।

আমরা যখন প্রতিসারাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন একটা খুব দরকারী কথা আলোচনাটিকে সহজ রাখার জন্যে ইচ্ছা করে বলা হয়নি। সেই দরকারী কথাটি হচ্ছে একটি মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক আলোর রঙয়ের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ লাল আলো হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবার সময় যেটুকু বেঁকে যায় সবুজ আলো তার থেকে বেশি বাঁকে, নীল বা বেগুনী আলো আরো বেশি। আলোর কাঁপন দিয়ে জিনিসটি বোঝাতে হলে বলতে হবে কম্পন যত বেশি প্রতিসারাঙ্ক তত বেশি। কাজেই একটা জিনিস বুঝতে পারছ, একটা জিনিসের প্রতিসারাঙ্ক আসলে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, কি রঙ-এর আলো ব্যবহার করে মাপা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে সেটি কম বা বেশি হতে পারে। তবে ভরসার কথা হচ্ছে যে, প্রতিসারাঙ্ক যদিও আলোর রঙয়ের উপর নির্ভর করে তবে সেটি খুব বাড়াবাড়ি একটা কিছু নয়। সবচেয়ে বেশি প্রতিসারাঙ্ক সবচেয়ে কম প্রতিসারাঙ্ক থেকে হয়তো একশো ভাগের এক ভাগ বেশি। যদিও এত কম কিন্তু তবু এটি ব্যবহার করে সূর্যের আলো থেকে পুরো বর্ণালী পাওয়া সম্ভব।

যদি কখনো কয়েকটি বিভিন্ন রঙয়ের আলো একসাথে মিশিয়ে একটা মাধ্যমের ভিতর প্রবেশ করতে দেয়া হয় তাহলে একটা মজার ব্যাপার ঘটে। রঙ ভিন্ন বলে তাদের প্রতিসারাঙ্কও ভিন্ন। কাজেই সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন দিকে বেঁকে আলাদা হয়ে যায়। তোমরা কেউ কেউ হয়ত ভাবছ তাহলে সূর্যের আলো কাঁচের জানালা দিয়ে ঢোকার সময় আলাদা হয়ে যায় না কেন? কারণটা খুবই সহজ, কাঁচের ভিতরে সত্যি সত্যি আলোগুলো ভাগ

হয়ে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু ভালভাবে ভাগ হবার আগেই আলো কাঁচ থেকে বের হয়ে আসে, জানালার কাঁচ তো কখনই অস্বাভাবিক মোটা হয় না। আলো যখন কাঁচ থেকে বের হয়ে আসে তখন ঢোকার সময় যে রঙ যেটুকু বেঁকে ছিল ঠিক ততটুকু উল্টো দিকে বেঁকে যায়, ফলে সব কয়টি রঙ একই দিকে বেরিয়ে আসে। আমাদের চোখ আর সেগুলি আলাদা করে ধরতে পারে না। কাঁচের দুই পৃষ্ঠ সমান্তরাল বলে এই ব্যাপারটি ঘটে। সমান্তরাল না হলে কিন্তু রঙগুলো বের হবার সময় একই দিকে বের হতে পারত না, তখন সত্যি সত্যি রঙগুলো আলাদা হয়ে যেতো। এই জন্যে সূর্যের আলোতে একটা প্রিজম ধরলে সবগুলি রঙ খুব সুন্দর ভাবে আলাদা (নিচের ছবি) হয়ে যায়। নিউটন প্রথমে এটি করে বর্ণালী তৈরি করেছিলেন। তিনি আরেকটি প্রিজম উল্টো করে ধরে

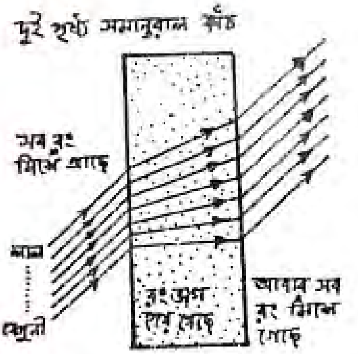


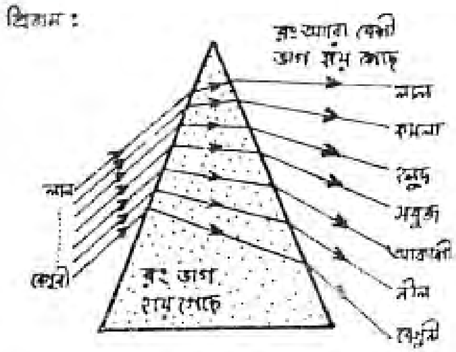


আবার সবগুলো রঙকে মিশিয়েও দিয়েছিলেন। তোমাদের পক্ষে হয়তো প্রিজম জোগাড় করা খুব সহজ নাও হতে পারে। তাই মনে রেখো, যে-কোন স্বচ্ছ জিনিস যেটির দুই পৃষ্ঠ সমান্তরাল নয় সেটি প্রিজমের মত ব্যবহার করবে। সবচেয়ে সুন্দর ভাবে দেখা সম্ভব একটা আয়না পানিতে বাঁকা করে রেখে। একটা পাত্রে খানিকটা পানি রেখে সেটি (নিচের ছবি) ঘরের ভেতর এমন জায়গায় রাখ যেখানে রোদ এসে পড়ছে। এবারে একটা আয়না পানিতে নামিয়ে দিলে আয়নায় আলো প্রতিফলিত হয়ে সামনের দেয়ালে পড়বে।

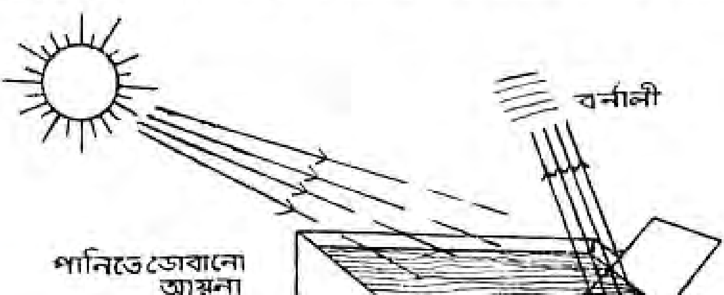


পানিতে বাঁকা করে ডোবানো আয়না দিয়ে সূর্যের আলোকে ভেঙ্গে বর্ণালী তৈরি করা সম্ভব

আলোটুকু বের হবার সময় যে ব্যাপারটি ঘটবে প্রিজমের ভিতর ঠিক সেং একই ব্যাপার ঘটে থাকে। কাজেই দেয়ালে অপূর্ব বর্ণালী দেখা যাবে। আরো এক ভাবে বর্ণালী দেখা সম্ভব। জানালা দিয়ে যখন ঘরে রোদ এসে ঢোকে তখন জানালার উপর একটা কাঁচে র গ্লাস পানি ভর্তি করে রেখে দিলে (নিচের ছবি) সূর্যের আলো সেই পানির ভিতর ঢুকে, গ্লাসের স্বচ্ছ পৃষ্ঠ দিয়ে বের হবার সময় বর্ণালী তৈরি করে, এটি দেয়ালে তৈরি না হয়ে

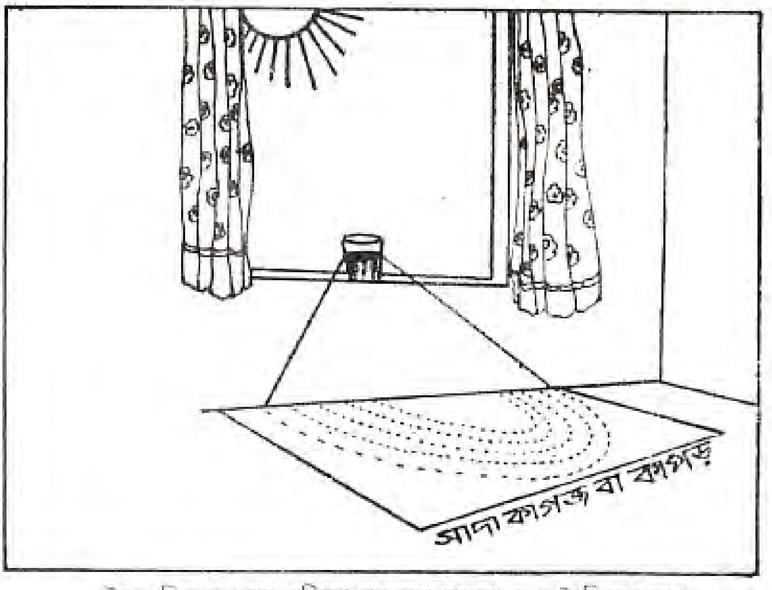


রৌদ্রালোকিত জানালায় পানিভরা গ্লাস রেখে মেঝেতে রংধনু তৈরি করা সম্ভব

মেঝেতে তৈরি হয়। একটা সাদা কাগজ বিছিয়ে দিলে সেটি আরো স্পষ্ট দেখা যাবে। মনে রেখো জানালা দিয়ে পুরো রোদটুকুও যদি মেঝেতে এসে পরে তাহলে বর্ণালীটি রোদের ভেতর দেখা যাবে না, তাই অল্প একটু ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ ঢুকতে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

যারা কখনো নিজেরা বর্ণালী তৈরি করনি তারা নিশ্চয়ই প্রকৃতির তৈরি বর্ণালী দেখেছ। সকালে কিংবা বিকালে যদি কখনো বৃষ্টি হবার পর হঠাৎ করে রোদ ওঠে তাহলে বাইরে বের হলেই আকাশে রঙধনু দেখা যায়। রঙধনু তৈরি হয় বৃষ্টির ফোঁটা থেকে। সূর্যের আলো বৃষ্টির ফোঁটার ভিতর ঢুকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে বের হয়ে আসে। আগেই বলেছি আলোর প্রতিসারাঙ্ক রঙয়ের উপর নির্ভর করে, তাই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে সূর্যের আলো বের হবার সময় (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) ভিন্ন ভিন্ন রঙয়ে ভাগ হয়ে যায়। লাল আলো সূর্যের আলোর ৪২° কোণ করে বের হয়, বেগুনী আলো বের হয় ৪০° কোণ করে। তাই সব সময়েই রঙধনুতে লাল আলো থাকে উপরে আর বেগুনী আলো নিচে। রঙধনু সত্যি সত্যি দেখতে ধনুর মত হয়, তার মানে এই নয় যে

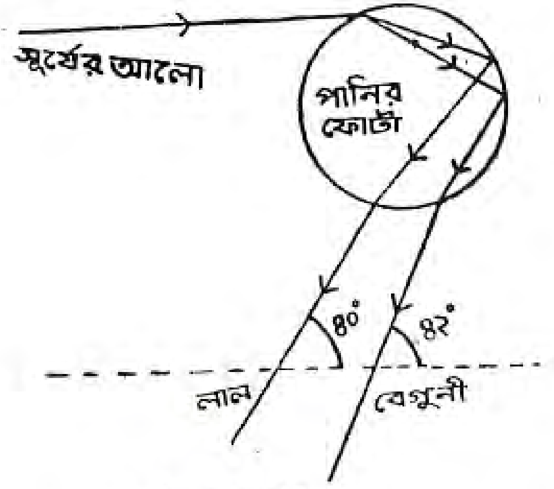


সূর্যের আলোতে বর্ণালী

শুধুমাত্র ওখানকার বৃষ্টির ফোঁটা থেকে আলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হয়ে আসছে। আসলে প্রত্যেকটি পানির ফোঁটা থেকেই আলো ভিন্ন ভিন্ন রঙয়ে ভাগ হয়ে ফিরে আসে, কিন্তু শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট বৃত্তাকার পানির ফোঁটা থেকে আলোগুলো আমাদের চোখে আসা সম্ভব। কারণটা পুরোপুরি জ্যামিতিক।

যারা অনেকদিন রঙধনু দেখনি, কিন্তু দেখার ইচ্ছে করছে তারা ইচ্ছা করলে নিজেরাই রঙধনু তৈরি করে দেখতে পারে। সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে রোদের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে পানি সাবধানে ফুঁ দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে বের কর, যে যত ভাল করে বের করতে পারবে তার রঙধনু তত সুন্দর হবে। অন্য যে-কোনভাবে পানি ছড়াতে পারলেও হয়, শুধু খেয়াল রাখতে হবে যেন পানির ধারা না হয়ে অসংখ্য পানির বিন্দু তৈরি হয়।

## আলোর ব্যতিচার

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, সাবানের পানি দিয়ে বুদবুদ তৈরি করলে বা পানির উপর তেল ছড়িয়ে পড়লে সেখানে চমৎকার সব রঙ খেলা করতে দেখা যায়। সাবানের পানি বা তেল কোনটির মাঝেই কোন রঙ লুকিয়ে নেই, বুঝতেই পারছ সূর্যের আলোর রঙগুলোই কোন না কোন ভাবে আলাদা হয়ে আসছে। তোমরা দেখবে আলোকে তরঙ্গ হিসাবে ধরে নিলে এই জিনিসগুলো কত সহজে বোঝা সম্ভব।

তরঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মটির নাম ব্যতিচার। ব্যতিচার বোঝার জন্যে পানির তরঙ্গ কল্পনা করে নিলে অনেক সুবিধা হয়। তোমরা যারা পানিতে তরঙ্গ বা ঢেউ দেখেছ তারা জান তরঙ্গটি পানিকে উপরে নিচে নাড়াতে থাকে। কোনভাবে কেউ যদি একই জায়গায় এমনভাবে দুটি ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ এনে হাজির করতে পারে যেন একটি তরঙ্গ

যখন পানিটাকে উপরে তোলার চেষ্টা করছে অন্য তরঙ্গ তখন সেটিকে নিচে নামাতে চেষ্টা করছে, তাহলে পানিটা ওপরেও উঠতে পারবে না নিচেও নামতে পারবে না। ফলে মনে হবে ঠিক ঐ জায়গাটিতে তরঙ্গের কোন বিস্তার নেই, বা কোন তরঙ্গই নেই। একটি তরঙ্গ দিয়ে অন্য আরেকটি তরঙ্গকে এভাবে ধ্বংস করে দেয়ার নাম ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার। ঠিক এর উল্টোটাও সম্ভব, দুটি তরঙ্গকে এক জায়গাতে এমনভাবে হাজির করা সম্ভব যেন দুটি তরঙ্গই একই সাথে পানিকে উপরে তোলার চেষ্টা করবে আবার একই সাথে নিচে নামানোর চেষ্টা করবে। এর ফলে সেখানে অনেক বড় একটা তরঙ্গের (নিচের ছবি) সৃষ্টি হয়। এই ধরনের ব্যতিচারের নাম গাঠনিক ব্যতিচার।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুটি তরঙ্গ এমনভাবে যুক্ত করা যায় যে

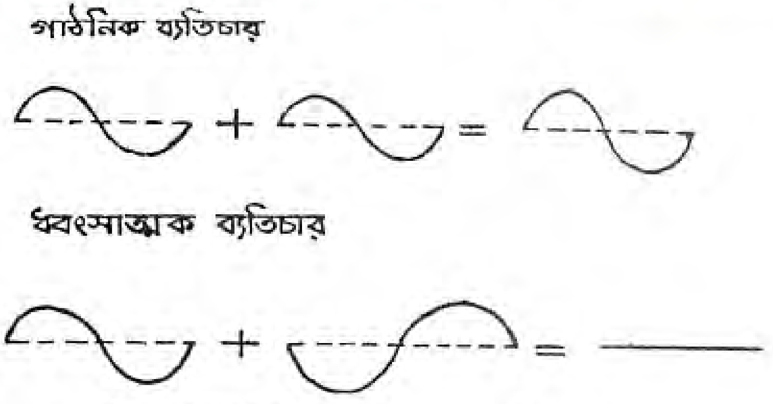


দুটি তরঙ্গের মাঝে গাঠনিক বা ধ্বংসাত্মক দু'ধরনের ব্যতিচারই হতে পারে

তারা একটি আরেকটিকে ধ্বংস করে ফেলে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কিংবা দুটি মিলে আরেকটি বড় তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে। এটি শুধু পানির তরঙ্গের জন্যে সত্যি নয়, যে-কোন তরঙ্গের জন্যে সত্যি। আলোর বেলাতেও সেটি হয়ে থাকে। আর সে জন্যেই সাবান পানির বুদবুদ কিংবা পানির ওপর ছড়িয়ে থাকা তেলের ওপর অপূর্ব সুন্দর রঙ দেখা সম্ভব। সাবান পানির বুদবুদ কিংবা পানির ওপর ছড়িয়ে থাকা তেল দুটিই হচ্ছে অত্যন্ত পাতলা, বলতে পার আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি। যখন এর ওপর আলো এসে পড়ে তখন এই পাতলা পৃষ্ঠের ওপর থেকে এবং নিচের থেকেও (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) আলো প্রতিফলিত হয়ে আসে। ওপরের পৃষ্ঠ এবং নিচের পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত আলোর ভেতরে ধ্বংসাত্মক বা গাঠনিক দুই ধরনের ব্যতিচারই হতে পারে, সেটি নির্ভর করে পৃষ্ঠটি পুরু এবং আলোটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত। একটি বিশেষ পুরুত্বের জন্যে হয়তো শুধু একটা বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার হয়ে সেটিকে অদৃশ্য করে দিতে পারে। সূর্যের আলো থেকে যদি কোনভাবে নীল আলোকে অদৃশ্য করে দেয়া যায় তাহলে সেটিকে দেখাবে লালচে। আবার পাতলা পৃষ্ঠের পুরুত্ব একটু বাড়িয়ে যদি লাল আলোকে অদৃশ্য করে দেয়া যায় তাহলে আলোটাকে দেখাবে নীলচে। বর্ণালীর সবকয়টি

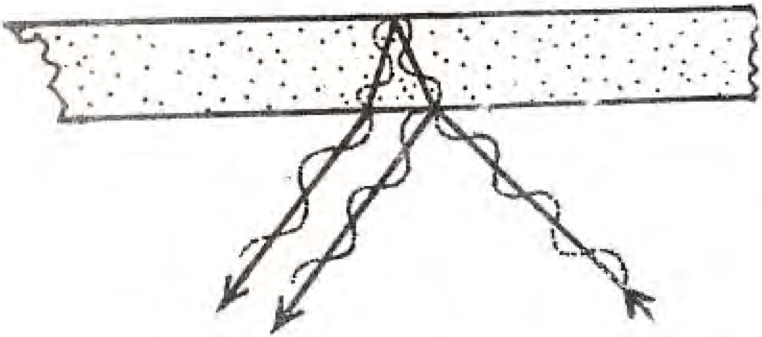

পাতলা মাধ্যমে উপরের এবং ভিতরের পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত আলোর মাঝে ব্যতিচার হতে পারে

রঙ থাকলে সেটার কোন রঙ নেই বলে মনে হয়, কিন্তু একটা অনুপস্থিত থাকলে অন্যগুলোর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তাই সাবান পানির বুদবুদ বা পানির ওপরে ছড়ানো তেলের পৃষ্ঠ থেকে আমরা যে রঙ দেখি সেটি আসলে এসেছে আলোর তরঙ্গের ব্যতিচার থেকে! তোমরা যারা সাবানের বুদবুদ তৈরি করতে গিয়ে দেখেছ খুব তাড়াতাড়ি সেটি ফেটে যাচ্ছে তারা ৩ ভাগ গ্লিসারিন, ১ ভাগ সাবানের সাথে ১ ভাগ পানি দিয়ে বুদবুদ তৈরি করে দেখ সেটা সহজে ফাটবে না! এ ধরনের বুদবুদ যে কত দীর্ঘ সময় না ফেটে থাকতে পারে তা তোমরা দেখে অবাক হয়ে যাবে!

আলোর ব্যতিচারের পরীক্ষা করা অনেক সহজ হত যদি একটা নির্দিষ্ট কম্পনের আলো পাওয়া যেতো। সাধারণ আলোতে সব কম্পনের আলোই মিশে থাকে। তাই ব্যতিচারের পরীক্ষা করে একটি নির্দিষ্ট কম্পন বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে অদৃশ্য করে ফেললেও অন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো রয়ে যায় বলে সেটি ঠিক ধরা যায় না। যেমন একটি উত্তল লেন্সকে একটা কাঁচের ওপরে রাখা হলে ঠিক যে বিন্দুতে লেন্সটি কাঁচ স্পর্শ করেছে সেখানে সব সময়ই ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার হয়ে সে জায়গাটি কালচে দেখা যায়। যদি একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো পাওয়া সম্ভব হত তাহলে এই কালো বিন্দুকে ঘিরে অসংখ্য আলো এবং অন্ধকারের বৃত্ত দেখা যেত। নিউটন প্রথম এই পরীক্ষাটি করেছিলেন বলে একে বলা হয় 'নিউটনের রিং'। তোমরা যদি সাধারণ আলোতে এটি করার চেষ্টা কর তাহলে কালো বিন্দুটিকে ঘিরে একটি, বড় জোর দুটি বৃত্ত দেখতে পাবে এবং সেটিও যথেষ্ট কষ্ট করে দেখতে হয়। লেন্স না পেলে সাধারণ চশমার কাঁচের উত্তল পৃষ্ঠটি একটা সমতল কাঁচের উপর চেপে ধরলেও নিউটনের রিং দেখা সম্ভব।

আলোর ব্যতিচারের সবচেয়ে সুন্দর পরীক্ষা করা সম্ভব একটা নির্দিষ্ট কম্পনের আলো দিয়ে। সেটি তৈরি করা খুব কঠিন নয়। একটা প্লেটে দু তিন চামচ লবণ রেখে তার উপরে একটা মোমবাতি শুইয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিলে (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) আস্তে আস্তে মোমবাতির শিখাটি লবণের জন্যে একটা হলুদাভ রঙ নিয়ে নেবে। এই হলুদ আলোটি আসলে একটা খুব নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (৫৮৯০ অ্যাঙ্গস্ট্রম) আলো। কেন লবণ থেকে এই রকম নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো পাওয়া সম্ভব আমরা পরে সেটা নিয়ে আলোচনা

ব্যতিচারের ফলে কাঁচের উপরে দেখা যাবে আলো ও অন্ধকারের ডোরা

করব। মোমবাতির শিখাটি থেকে হলুদ আলো পাওয়ার পর তার সামনে দুটি কাঁচ একটার ওপরে আরেকটা ধরলেই সেখানে আলো এবং অন্ধকারের ডোরা দেখা যাবে। সাধারণ কাঁচকে যদিও খুব সমতল দেখা যায় তবুও যখন একটির ওপরে আরেকটি রাখা হয় তাদের মাঝে খুব অল্প ফাঁক রয়ে যায়। এই ফাঁকের ওপরের এবং নিচের আলোর মাঝে ব্যতিচার হয়ে আলো এবং অন্ধকারের ডোরা দেখা যায়। সেখানে আলো দেখা যায় যেখানে গাঠনিক ব্যতিচার হয়েছে আর যেখানে অন্ধকার দেখা যায় সেখানে হয়েছে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার। তোমরা অবশ্যি এই পরীক্ষাটি করে দেখবে, এবং এটি করার সময় মোমবাতি ছাড়া অন্য কোন কিছু থেকে যেন অন্য কোন আলো না আসে সেটা লক্ষ্য রাখবে।

## আলোর অপবর্তন

ব্যতিচারের মতই তরঙ্গের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম রয়েছে, সেটির নাম অপবর্তন। আলোর অপবর্তন সম্পর্কে শুনলে। তোমার নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে, কারণ আলোর সরলরেখায় যাওয়া নিয়ে আগে যে কথাটি বলেছিলাম, এটা তার উল্টো। মনে কর একটা ফুটো দিয়ে আলো যাচ্ছে, দেখা যাবে আলো সরলরেখায় যাচ্ছে। এবারে যদি কোনভাবে ফুটোটাকে খুব ছোট করা যায় তাহলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে, দেখা যাবে আলো সোজা না গিয়ে (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) এবারে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে রেখো এটি হতে পারে যখন ফুটোটি খুব ছোট হয়, আলোর তরঙ্গের প্রায় সমান বা তার থেকেও ছোট। শুধুমাত্র ছোট ফুটো দিয়ে যাবার সময়েই যে এটা ঘটে থাকে সেটা সত্যি নয়, আলো যে-কোন ধরনের অস্বচ্ছ জিনিস দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলেই সেই কিনারা থেকে ছড়িয়ে পড়ে। আলো বা অন্য যে-কোন তরঙ্গের এই ধর্মকে বলা হয় অপবর্তন।

আমরা সচরাচর আলোর অপবর্তন দেখে অভ্যস্ত নই কারণ এটি ভাল বোঝা যায় আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান বা তার চেয়ে ছোট ফুটো থাকলে, সেটি খুব সহজ ব্যাপার নয়। অন্য ধরনের তরঙ্গে সেটি অনেক সহজ। যেমন ধরা যাক শব্দের কথা, শব্দের তরঙ্গ

দৈর্ঘ্য অনায়াসে তিন চার ফুট হতে পারে, কাজেই দরজা বা জানালার মত বড় বড় ফুটো দিয়েও শব্দের অপবর্তন খুব সহজেই হয়ে থাকে। এই জন্যে পাশের ঘর থেকে কেউ কথা বললেও আমরা বেশ স্পষ্ট শুনতে পারি, শব্দের অপবর্তনের জন্যে গলার স্বর একঘর থেকে আরেকঘরে সহজে ছড়িয়ে পড়ে।

আলোর অপবর্তন পরীক্ষা করার জন্যে যে জিনিসটি ব্যবহার করা হয় তার নাম গ্রেটিং। গ্রেটিং হচ্ছে পাতলা স্বচ্ছ কোন জিনিস যেটিতে এক ইঞ্চিতে হয়তো বিশ ত্রিশ হাজার সমান্তরাল দাগ কাটা থাকে। খালি চোখে গ্রেটিং দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই এবং সেটা তোমাদের পক্ষে দেখতে পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। গ্রেটিংকে বলা যায় এক ইঞ্চিতে বিশ কি ত্রিশ হাজার অত্যন্ত সরু সরু ফাঁক যার ভেতর দিয়ে আলোর অপবর্তন হওয়া সম্ভব। কাজেই যখনই গ্রেটিংয়ে আলো পড়ে প্রত্যেকটি ফাঁক দিয়ে আলোর অপবর্তন হয়ে আলো অন্যদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গ্রেটিংয়ে এর পরে আরো একটি মজার ব্যাপার ঘটে। অপবর্তিত আলোগুলোর ভিতরে ব্যতিচার হতে থাকে। ব্যতিচারের পরে দেখা যায় নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো একটা নির্দিষ্ট দিকে বেঁকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেছে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে বিভিন্ন রংয়ের আলো মিশে থাকলে প্রিজম দিয়ে সেটিকে আলাদা করে ফেলা যায়। গ্রেটিং দিয়ে সেটি আরো ভালো করে করা সম্ভব। গ্রেটিংয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে ফাঁকগুলো খুব সরু করে গ্রেটিংয়ের বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনেকগুণ বাড়িয়ে ফেলা যায়।

বুঝতেই পারছ একটা গ্রেটিং দিয়ে অনেক মজার জিনিস করা সম্ভব। গ্রেটিং জোগাড় তোমাদের পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। গ্রমোফোন বা রেকর্ড প্লেয়ারের রেকর্ডকে অনেকটা গ্রেটিং হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। তবে সেটি অস্বচ্ছ বলে তার উপরে আলো প্রতিফলিত হতে দিয়ে সেই প্রতিফলিত আলোটাকে দেখতে হয়। একটু চেষ্টা করলে বেশ কয়েকটা রঙ পর্যন্ত দেখা সম্ভব, কিন্তু মনে রেখো রেকর্ডের খাঁজগুলোর মধ্যে ফাঁক তুলনামূলকভাবে অনেক বড়, তাই সেটিকে উঁচুদরের গ্রেটিং হিসেবে কখনোই ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এর থেকে অনেক ভাল গ্রেটিং হচ্ছে নাইলন বা মসলিনের মত খুব পাতলা ফিনফিনে কাপড়। এধরনের কাপড়ের সুতাগুলো খুব সরু বলে দু'টো সুতার মাঝখানে ফাঁকও খুব সরু। পাশাপাশি অনেকগুলো সুতা থাকায় গ্রেটিংয়ের মত পাশাপাশি অনেকগুলো ফাঁক রয়েছে। তবে সুতা খাড়াভাবে এবং লম্ব দুভাবেই রয়েছে বলে আলো দুদিকেই অপবর্তিত হয়। তাই পাতলা ফিনফিনে কোন কাপড় দিয়ে বহুদূরের কোন

আলোর অপবর্তন দেখার জন্যে আলোকে খুব ছোট ফুটোর ভিতর দিয়ে যেতে দিতে হয়

আলোর দিকে তাকালে অপবর্তিত হয়ে একটা ক্রসের মত বা যোগ চিহ্নের মত দেখা যায়। সেই ক্রসে ভাল করে লক্ষ্য করলে আলোর রঙগুলোকে ভাগ হয়ে যেতে দেখা মোটেই বিচিত্র নয়।

## আলোর বিক্ষেপণ

আকাশের রঙ নীল দেখে আমরা এত অভ্যস্ত যে কখনোই এটা নিয়ে প্রশ্ন জাগে না, একবারও মনে হয় না আকাশটা নীল না হয়ে সবুজ কিংবা হলুদ হল না কেন। আবার সন্ধ্যাবেলা সূর্য ডোবার সময় আকাশ লাল হয়ে যায়। সেটিও, লাল না হয়ে বেগুনী বা অন্য কোন রংয়ের হয় না কেন তা নিয়েও কারো মনে সচরাচর কোন প্রশ্ন জাগে না। কিন্তু কেউ যদি কখনো রকেটে করে মহাকাশে যেতো তাহলে আকাশ দেখে সত্যি সত্যি তার মনে অনেক প্রশ্ন জাগতো—কারণ মহাকাশে আকাশ ঘুটঘুটে কালো, যদি আকাশে সূর্য থাকে তবুও। কারণটা বোঝা খুব কঠিন নয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বাতাস ছাড়াও রয়েছে হাজারো ধরনের সূক্ষ্ম ধুলাবালি। সূর্যের আলো যখনই বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে সেটি বাতাস এবং ঐসব সূক্ষ্ম ধুলাবালি দিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। র‍্যালে নামে একজন বিজ্ঞানী অনেক আগেই দেখিয়েছেন যে আলোর নীল এবং বেগুনী অংশটুকু বেশি বিক্ষিপ্ত হবে, সবচেয়ে কম বিক্ষিপ্ত হবে লাল বা কমলা আলো। তাই সূর্যের আলো যখনই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তার নীল ও বেগুনী অংশটুকু বিক্ষিপ্ত হয়ে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের চোখে সেটি চমৎকার একটা নীল রঙ হিসেবে ধরা পড়ে। ঠিক যে কারণে আকাশ নীল দেখা যায় সেই কারণেই সন্ধ্যাবেলা আকাশকে দেখায় লাল। তখন সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের অনেকটুকু (নিচের ছবি) পার হয়ে আসে বলে তার তীব্রতা অনেক কমে যায় বলে সূর্যের দিকে তাকানো যায়। তাছাড়া সূর্যের আলোর নীল (ও বেগুনী) অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে আগেই ছড়িয়ে পড়ে বলে শুধুমাত্র লাল অংশটুকুই আমাদের চোখ পর্যন্ত

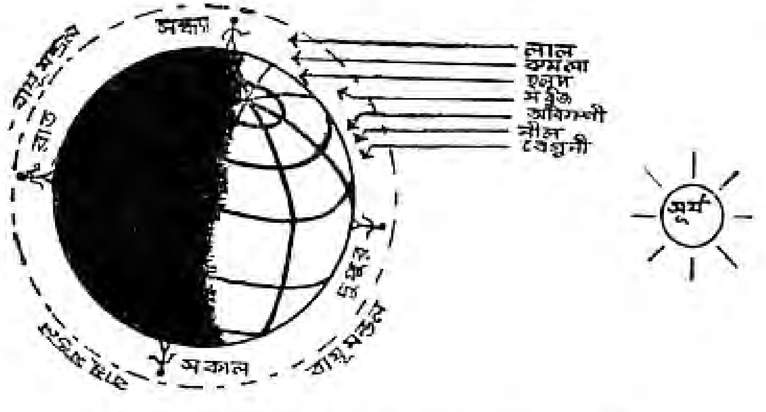


সূর্যের আলোর নীল অংশটুকু বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় বলে আকাশের রং নীল, সন্ধ্যাবেলা ও সকাল বেলা সূর্যের তীব্রতা কমে গেলে বাকি লাল অংশটুকু দেখা সম্ভব

পৌঁছাতে পারে, তাই আকাশকে মনে হয় লাল। মহাকাশে বায়ুমণ্ডল বা ধুলাবালি কিছুই নেই, আলো সেখানে বিক্ষিপ্ত হতে পারে না, তাই আকাশ সব সময়েই ঘুটঘুটে কালো।

আকাশের নীল রংয়ের একটা ছোট পরীক্ষা তোমরা ঘরে বসে করে দেখতে পার। এক গ্লাস পরিষ্কার পানি নিয়ে একপাশ থেকে পানিটার উপরে আলো এসে পড়তে দাও। এবার পানিতে দুই এক ফোঁটা দুধ মিশিয়ে দাও, সাথে সাথে পানিটা একটা নীলাভ রঙ নিয়ে নেবে। দুধে আসলে ছোট ছোট সাদা রংয়ের কণা রয়েছে, বায়ুমণ্ডলে ধুলাবালিতে যা হয়ে থাকে দুধের ছোট ছোট কণাগুলোতে ঠিক তাই হয়ে, আলোর নীল অংশটুকু বিক্ষিপ্ত হয়ে পানিটাকে একটা হালকা নীল রঙ দেয়। দুধ মেশানো পানিটার ভেতর দিয়ে আলোটার দিকে তাকালে দেখবে, আলোটা আসলে যতটুকু লালচে তারচেয়ে বেশি লালচে মনে হচ্ছে। ঠিক একই কারণে ধোঁয়াকে নীল মনে হয়, আবার ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে সূর্য বা অন্য আলোকে অনেক বেশি লাল দেখায়।

আলোর বিক্ষেপণের আরো একটি উদাহরণ তোমরা দেখে থাকবে। অনেকেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ মাঝে মাঝে চাঁদকে ঘিরে একটা গোল আলোর বৃত্ত দেখা যায়। আকাশে সিররাস নামে একটা বিশেষ ধরনের মেঘ থাকলে এটি হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই বৃত্তটির ব্যাস সবসময়েই ২২° কোণ করে থাকে। বরফের কণার ভেতর দিয়ে আলোকে প্রতিসারিত হতে দিলে এরকমটি হতে পারে, তাই ধরে নেয়া হয় আকাশের ঐ বিশেষ ধরনের মেঘে বরফের কণা রয়েছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ চাঁদকে ঘিরে এই ধরনের আলোর বৃত্ত তৈরি হওয়াটি প্রতিসরণ এবং বিক্ষেপণ দুটিরই উদাহরণ। পৃথিবীতে অনেক জায়গাতে চাঁদকে ঘিরে আলোর এই বৃত্তটিকে বৃষ্টিপাতের পূর্বলক্ষণ বলে ধরা হয়।

## অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ

সাধারণত তরঙ্গের একটা মাধ্যম থাকে। পানির তরঙ্গে পানি হচ্ছে মাধ্যম, শব্দ তরঙ্গের মাধ্যম হচ্ছে বাতাস। অবশ্য শব্দ বাতাস ছাড়া অন্য মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যেতে পারে, পানিতে ডুব দিয়ে আঙুল মটকানের শব্দ শুনে দেখ। (কিংবা রেললাইনে কান পেতে বহুদূরে রেলের শব্দ শোনার চেষ্টা করতে পার। খবরদার যখন রেলগাড়ি দূরে দেখা যাচ্ছে তখন কান পাততে যেও না।) এ ছাড়াও লম্বা একটা স্প্রিংয়ের ভেতর দিয়ে তরঙ্গ পাঠানো সম্ভব, কিংবা একটা দড়ি হাত দিয়ে নাড়িয়েও তরঙ্গের সৃষ্টি করা যায়। এই সব কয়টি তরঙ্গের মাধ্যমে রয়েছে এবং লক্ষ্য করার ব্যাপারটি হচ্ছে তরঙ্গ যাবার সময় মাধ্যমটি কিন্তু সাথে সাথে চলে যায় না। দড়ি নাড়িয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করলে শুধু দড়িটা উপরে নিচে করতে থাকে, তরঙ্গটা এগিয়ে যায় কিন্তু আস্তে দড়িটা কখনো এগিয়ে যায় না। সবচেয়ে ভালভাবে বোঝার উপায় হচ্ছে পানির ঢেউ দিয়ে। সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ পানিতে যখন কোন একটা কিছু ভেসে থাকে তখন যদি ঢেউ আসে তাহলে জিনিসটা একই জায়গায় থেকে ঢেউয়ের তালে তালে উপরে নিচে নাচতে থাকে, কিন্তু ঢেউয়ের সাথে এগিয়ে যায় না (পানিতে ভেসে থাকা একটা জিনিস সামনে এগিয়ে যায় যখন পানিতে স্রোত থাকে, স্রোত আর তরঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস)। এই ব্যাপারটি শব্দের বেলাতেও সত্যি। আমরা যখন কোন শব্দ শুনি তখন শব্দ তরঙ্গটি শুধু বাতাসের মাঝে দিয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছায়, বাতাসটুকু কিন্তু স্থির থাকে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ তরঙ্গ

প্রবাহ হবার সময় মাধ্যম কখনো স্থান পরিবর্তন করে না একই জায়গায় দুলতে থাকে বা কাঁপতে থাকে বা উপরে নিচে  উঠতে এবং নামতে থাকে। আলোর জন্যেও এই কথাটি সত্যি। মজার ব্যাপার হচ্ছে আলোর জন্যে কোন মাধ্যমেরই দরকার হয় না। প্রশ্ন করতে পার যদি মাধ্যম নাই থাকে তাহলে তরঙ্গটা কিসের? উত্তর আগেই বলা হয়েছে, আলোর তরঙ্গটি হচ্ছে তাড়িত এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের ! আলো এই তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে এগিয়ে যায়। তাই এর জন্যে আলাদা কোন মাধ্যমের দরকার হয় না। আলোর জন্যে যদি মাধ্যমের দরকার হত তাহলে সূর্য থেকে আলো কোনদিন পৃথিবীতে এসে পৌছাতে পারত না, কারণ সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে রয়েছে মহাশূন্য। সেখানে বলতে গেলে কোন কিছুই নেই। ম্যাক্সওয়েল যখন তাঁর বিখ্যাত তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রের বিখ্যাত সমীকরণগুলো লিখেছিলেন তখন ধারণা করা হত মাধ্যম ছাড়া বুঝি কোন তরঙ্গ কোথাও যেতে পারে না। তাই সবাই ভাবত 'ইথার' নামে একটা জিনিস সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আলো সেই ইথারকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে ইথার নামেরই সেই অদৃশ্য মাধ্যমকে একেবারে দূর করে দিয়েছিলেন, সবাই বুঝতে পেরেছিল আলো বা বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের কোন মাধ্যমের দরকার হয় না। (অনেক কবি সাহিত্যিক এখনো সে খবর পাননি, তাঁরা এখনও  লিখে চলেছেন, "তার কান্নার সুর ইথারে ছড়িয়ে পড়ল..." বা এমনি ধরনের কিছু!)।

তরঙ্গকে আমরা মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। অনুপ্রস্থ তরঙ্গ হচ্ছে সেই সব তরঙ্গ যেগুলো সামনে এগিয়ে যাবার সময় মাধ্যমকে (বা তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রকে) উপরে নিচে কম্পন করিয়ে থাকে। যেমন পানির ঢেউ বা আলো  বা দড়ি নাড়িয়ে (নিচের ছবি) তৈরি করা তরঙ্গ। এই ধরনের তরঙ্গই বেশি এবং আমাদের অনেকের ধারণা হয়ে থাকতে পারে বুঝি সব তরঙ্গেই কিছু একটা উপরে নিচে উঠতে এবং নামতে থাকে। সেটি সত্য নয়। অনেক তরঙ্গ আছে যেখানে মাধ্যম উপরে নিচে না দুলে সামনে পিছে নড়তে থাকে। যেমন স্প্রিংয়ের মাঝে তৈরি তরঙ্গ

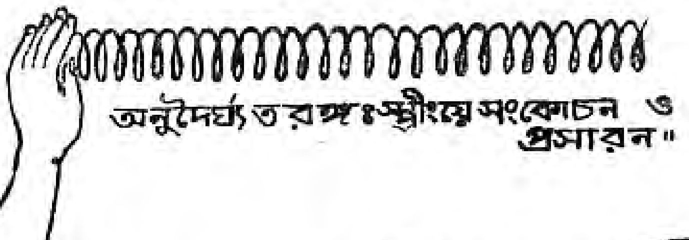


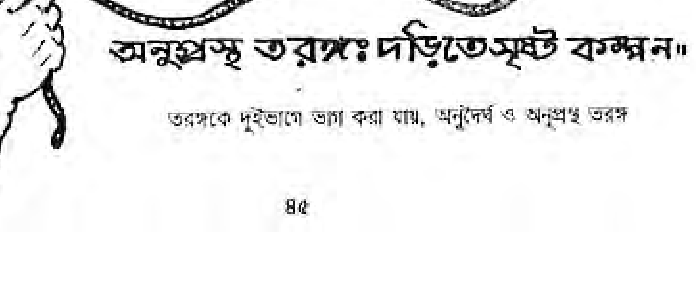


তরঙ্গকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ তরঙ্গ

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ছবি) কিংবা শব্দ তরঙ্গ। এই ধরনের যে সব তরঙ্গ মাধ্যমটিকে সামনে পেছনে কম্পন করিয়ে তরঙ্গটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তার নাম অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। শব্দ এগিয়ে যাবার সময় বাতাসে সংনমন (বেশি চাপ) এবং লঘুকরণ (কম চাপ) তৈরি করে এগিয়ে যায়। স্প্রিংয়ের বেলাতেও তাই, লম্বা একটা স্প্রিং কোথাও খুঁজে পেলে সেটি চোখে দেখাও সম্ভব।

## পোলারায়ন

অনুপ্রস্থ তরঙ্গের একটা বিশেষ ধর্ম রয়েছে, এর নাম পোলারায়ন। পোলারায়ন বোঝার জন্যে একটা দড়ির উদাহরণ নেয়া সবচেয়ে সহজ। মনে করা যাক তুমি হাত দিয়ে একটা দড়িতে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ। এই তরঙ্গটি উপরে নিচে উঠতে এবং নামতে থাকে বলে একটা লম্বা সরু ফাঁক দিয়ে (নিচের ছবি) এটিকে পার করিয়ে নেয়া সম্ভব। এবারে সেই ফাঁকটি যদি লম্বালম্বি ভাবে না রেখে আড়াআড়িভাবে রাখা যায়, তরঙ্গ আর যেতে পারবে না। অনুপ্রস্থ তরঙ্গের এই বিশেষ ধর্মটির নাম পোলারায়ন। আমরা বলতে পারি যেহেতু তরঙ্গটি লম্বালম্বিভাবে পোলারায়িত, তাই এটি আড়াআড়িভাবে রাখা একটা

অনুপ্রস্থ তরঙ্গের কম্পনের একটি নির্দিষ্ট দিক রয়েছে

ফাঁকের ভেতর দিয়ে যেতে পারে না। বুঝতেই পারছ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গে এরকম কিছু করা সম্ভব নয়।

আগেই বলা হয়েছে আলো একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ, কাজেই আলোকেও একটি নির্দিষ্ট দিকে স্পন্দন করতে দিয়ে সেটিকে সেই দিকে পোলারায়িত করা সম্ভব। যে বিশেষ জিনিসটি দিয়ে পোলারায়িত করা হয় তার নাম পোলারায়ক। সাধারণ আলো কোন নির্দিষ্ট দিকে পোলারায়িত হয়ে থাকে না, কারণ সেখানে অসংখ্য আলোক তরঙ্গ মিশে থাকে, আর সেই আলোক তরঙ্গগুলো প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন দিকে পোলারায়িত। যদি আলোকে একটি পোলারায়কের ভেতর দিয়ে পার করা হয় তাহলে পোলরায়কটি বেছে বেছে শুধু নির্দিষ্ট দিকে স্পন্দিত তরঙ্গকে যেতে দেবে। কাজেই পোলারায়কের ভেতর দিয়ে যাবার

পর আলো একটি নির্দিষ্ট দিকে পোলারায়িত হয়ে যাবে। এবারে আরো একটি পোলারায়ক যদি প্রথম পোলারায়কের পরে রাখা হয় তাহলে অনেক ধরনের মজার ব্যাপার ঘটতে পারে। যেমন, যদি দ্বিতীয় পোলারায়কটির পোলারায়নের দিক আর প্রথম পোলারায়কের পোলারায়নের দিক একই দিকে হয় (নিচের ছবি) তাহলে আলো সোজা বের হয়ে আসবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয়টির পোলারায়নের দিক প্রথমটির পোলারায়নের দিকের সাথে একেবারে সমকোণে আড়াআড়িভাবে থাকে তাহলে একটু আলোও বের হতে পারবে না! যারা পোলারায়ক দেখেছে তারা নিশ্চয়ই জানে সেটি কি মজার জিনিস। দুটি

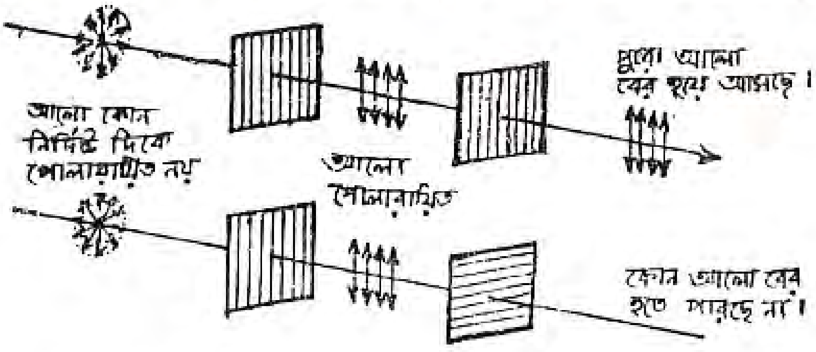


পোলারায়ক ও আলোর পোলারায়নের দিক একই দিকে হলে পুরো আলোটুকু বের হয়ে আসতে পারে

সমান্তরাল পোলারায়ক প্রায় স্বচ্ছ কাঁচের মত, আবার একটি পোলারায়ক আরেকটির সাথে সমকোণ আড়াআড়ি করে রাখলে সেটি সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ কালো একটি কাঁচের মত হয়ে যায়।

আলো সবচেয়ে ভালভাবে পোলারায়িত করার জন্য দরকার পোলারায়ক। কিন্তু অন্যভাবেও অল্প কিছু পোলারায়ন করা যায়। প্রতিফলনের পরে আলো সব সময়েই অল্প কিছু পোলারায়িত হয়ে যায়। এই জন্যে সমুদ্রতীরে ব্যবহার করার জন্যে পোলারায়ক দিয়ে একটা বিশেষ ধরনের কালো চশমা তৈরি করা হয়। সূর্যের আলো সমুদ্রের পানিতে প্রতিফলিত হবার পর সেটি যেদিক পোলারায়িত হয়, চশমার কাঁচের পোলারায়নের দিক তার সাথে সমকোণে আড়াআড়িভাবে রাখা হয়, ফলে প্রতিফলিত আলো চোখে এসে পৌঁছতে পারে না। তোমাদের পরিচিত যাদের কালো চশমা আছে তাদের চশমা পরীক্ষা করে দেখলে হয়তো কোন্ কোনটি পোলারায়ক বেরিয়ে পড়বে। পরীক্ষা করার জন্যে কোন পানিতে প্রতিফলিত আলোর দিকে তাকিয়ে চশমার কাঁচটাকে ঘোরাও। যদি দেখ প্রতিফলিত আলোর তীব্রতা একসময়ে বেড়ে যায় আবার একসময়ে কমে যায় তাহলে বুঝতে পারবে সেই চশমাটি পোলারায়ক দিয়ে তৈরি।

সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ধূলাবালিতে প্রতিফলিত হয়েও খানিকটা পোলারায়িত হয়ে থাকে। ভোরে পোলারায়ক ঘুরিয়ে আকাশের বিভিন্ন জায়গায় আলোর তীব্রতা পরীক্ষা করলে দেখা যায় মধ্যাকাশের আলোর তীব্রতার খানিকটা পরিবর্তন হয়। মানুষ খালি চোখে পোলারায়িত কিংবা সাধারণ আলোর পার্থক্য ধরতে পারে না। মৌমাছির চোখ

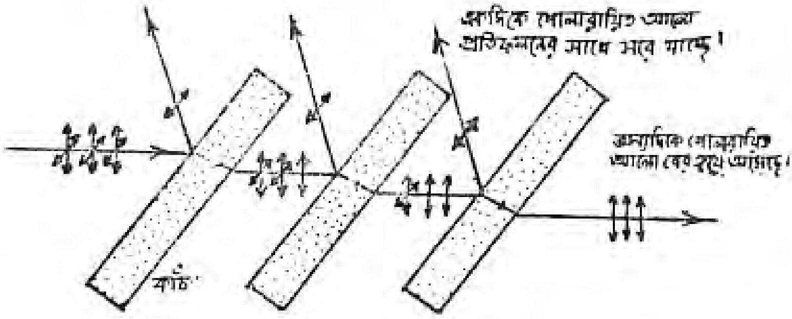


অনেকগুলো কাঁচের টুকরো ব্যবহার করে পোলারায়ক তৈরি করা সম্ভব (দুটি কাঁচের মাঝে কোন ফাঁক রাখার প্রয়োজন নেই, ছবিতে বোঝার জন্যে আঁকা হয়েছে)

বিশেষভাবে তৈরি বলে খালি চোখেই আলো পোলারায়িত কিনা বুঝতে পারে। বলা হয়ে থাকে দিক ঠিক রাখার জন্যে মৌমাছি তাদের এই বিদ্যা ব্যবহার করে থাকে।

তোমাদের পক্ষে পোলারায়ক জোগাড় করা কতটুকু সহজ ঠিক বলা সম্ভব নয়। যারা কোন ভাবেই পোলারায়ক খুঁজে না পাও তারা নিজেরাই একটা তৈরি করার চেষ্টা করে দেখতে পার। আগেই বলা হয়েছে প্রতিফলনের ফলে আলো একদিকে খানিকটা পোলারায়িত হয়ে যায়। কাজেই কোন আলোকে যদি অনেকবার প্রতিফলিত করা হয় তাহলে প্রত্যেকবারই প্রতিফলনের সাথে সাথে একটু করে পোলারায়িত আলো আলো থেকে কমে যাবে। ফলে যে আলোটা বেরিয়ে আসবে, সেখানে ঐ নির্দিষ্ট দিকে পোলারায়িত আলোর অভাব হয়ে যাবে। সেটিকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে আলোটিতে অন্যদিকে পোলারায়িত আলো তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে, বা আলোটি অন্যদিকে খানিকটা পোলারায়িত হয়ে যাবে। কাজেই অনেকগুলো কাঁচ যদি বাঁকা করে পাশাপাশি রাখা যায় (নিচের ছবি) তাহলে সেটি একটা পোলারায়ক হিসেবে কাজ করবে। ছবি বাঁধাই করার দোকান থেকে ছোট ছোট এক মাপের অনেকগুলো কাঁচের টুকরা এনে সেটি একটি ছোট বাক্সে ভরে নিয়ে আলো একদিক দিয়ে ঢুকিয়ে অন্যদিকে বের হওয়ার মত ব্যবস্থা করে দিতে পারলেই সেটি একটি পোলারায়ক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। মনে রেখো অন্তত দশ থেকে বারটি কাঁচের টুকরো ব্যবহার করে একটি মোটামুটি ভাল পোলারায়ক তৈরি করা যায়। পোলারায়ক তৈরি হওয়ার পর সেটি পরীক্ষা করার জন্য পানি থেকে প্রতিফলিত আলোর দিকে পোলারায়কটির ভেতর দিয়ে তাকাও। দেখবে পোলারায়কটি ঘোরালে আলোর তীব্রতার পরিবর্তন হবে। ভালভাবে একটি তৈরি হবার পর দ্বিতীয় আরেকটি ঠিক একইভাবে তৈরি করে নিয়ে মজার মজার পরীক্ষাগুলো করে দেখতে পার।

## চোখ

আলো সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে সব সময়ই চোখ নিয়ে আলোচনা করতে হয়, আমাদের চোখ দেখতে পায় বলেই তো আলো নিয়ে মানুষের এই কৌতূহল। কাজেই চোখ ঠিক কিভাবে কাজ করে, কিভাবে পৃথিবীর এত বিচিত্র রঙ আর সৌন্দর্য দেখতে

পারে, না জানা পর্যন্ত আলো সম্পর্কে জানার কোন অর্থই নেই। মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে তার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা এমন কি কখনো কখনো মনের ভাব পর্যন্ত বলে দেয়া সম্ভব! চোখের সৌন্দর্য নিয়ে যত কবিতা লেখা হয়েছে শরীরের আর অন্য কোন অংশ নিয়ে এত কবিতা লেখা হয়নি! কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে চোখ কিভাবে কাজ করে সেটি চোখের সৌন্দর্য বা তার অন্যান্য যে-কোন আবেদন থেকে হাজার গুণ চমকপ্রদ।

চোখের কাছাকাছি যে জিনিস রয়েছে সেটি হচ্ছে ক্যামেরা (তবে চোখের মত নিখুঁত করে যদি কোন ক্যামেরা তৈরি করা যেতো পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ একত্র করেও সেটি কেনা সম্ভব হত না)। ক্যামেরা এবং চোখ দুটি জিনিসের সামনেই একটা উত্তল (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) লেন্স থাকে। আলো এসে এই উত্তল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার পর পেছনে একটা উল্টো প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে। ক্যামেরায় সেখানে রাখা হয় ফিল্ম, চোখে রয়েছে রেটিনা, সেই প্রতিবিম্বটির ছবি ধরা পড়ে ফিল্মে, রেটিনা সেটিকে পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক সেটিকে সোজা করে গ্রহণ করে নেবার পর আমরা বলি যে 'দেখতে' পাচ্ছি! মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে চোখ এবং ক্যামেরার কাজ।

তোমরা যারা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলেছ বা ছবি তুলতে দেখেছ তারা নিশ্চয়ই জান ভাল ছবি তুলতে হলে ক্যামেরার ভেতরে ঠিক পরিমাণ আলো ঢুকতে দিতে হয়। এর বেশি হলে ছবি বেশি সাদা এবং কম হলে বেশি কালো হয়ে যায়। ক্যামেরার সামনের ফুটোকে বলা হয় অ্যাপারচার, সেই অ্যাপারচার বড় কিংবা ছোট করে আলোর পরিমাণ

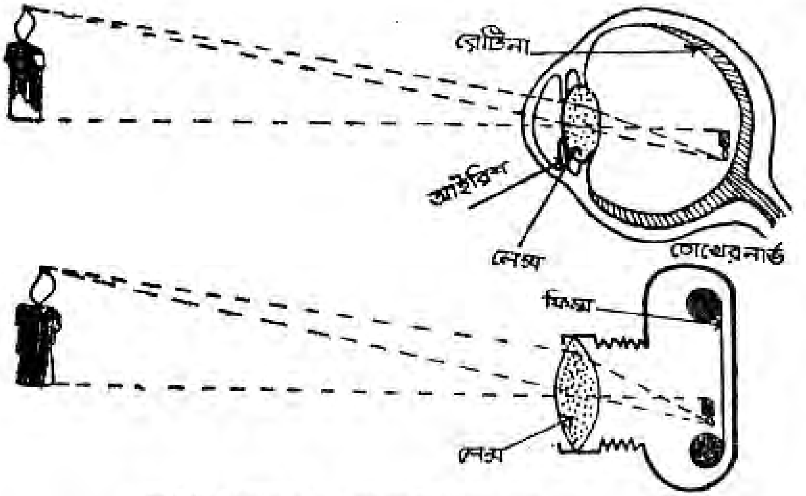


চোখ ও ক্যামেরার কাজ করার মূলনীতি প্রায় একই ধরনের

বাড়ানো বা কমানো হয়। আজকাল যেসব ক্যামেরা তৈরি হয় সেগুলো নিজে নিজেই বাইরের আলো দেখে বুঝতে পারে অ্যাপারচার কতটুকু বড় করলে ভাল ছবি তোলা সম্ভব এবং নিজে নিজেই ততটুকু বড় করে নেয়। আলো একটু কম বা বেশি হয়ে গেলেই

সাধারণ ফিল্ম দিয়ে আর ছবি তোলা সম্ভব নয়। কম আলোতে ছবি তুলতে হলে সাধারণ ফিল্ম পাল্টে বিশেষ ধরনের সুবেদী ফিল্ম ব্যবহার করতে হয়, কিংবা ফ্লাশ ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে আলো বাড়িয়ে দিতে হয়।

এবারে চোখের সাথে তুলনা করে দেখ। ভালভাবে দেখার জন্যে চোখকেও আলো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। চোখ আলো নিয়ন্ত্রণ করে আইরিশ দিয়ে। আইরিশ হচ্ছে সেই জিনিস যেটি দিয়ে মানুষের চোখের রঙ বর্ণনা করা হয়। বাদামী বা কালো চোখ বলতে বোঝানো হয় আইরিশের রঙ বাদামী বা কালো। আইরিশ আলো নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত নিপুণভাবে, তুমি যদি আগে কখনো না দেখে থাক তাহলে দেখে অবাক হয়ে যাবে। একটা আয়না নিয়ে আলোর কাছে বা রোদে বস। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে হঠাৎ করে চোখ খুলে আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকাও। দেখবে আইরিশ দ্রুত সংকুচিত হয়ে চোখের মাঝখানের কালো অংশটি ছোট করে দিচ্ছে। চোখের মণির মাঝখানের এই ছোট গোল কালো অংশটুকুর নাম পিউপিল। এই পিউপিলের ভেতর দিয়েই আলো চোখে প্রবেশ করে। বাইরে কতটুকু আলো থাকলে পিউপিল কত বড় হওয়া উচিত চোখ সবসময়েই নিজে নিজে ঠিক করে নেয়। আলো পিউপিল দিয়ে চোখে প্রবেশ করার পর চোখের লেন্স সেটিকে রেটিনার উপরে ফোকাস করে নিখুঁত একটি প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে। দূরের কোন জিনিস দেখার জন্যে লেন্সের কেন্দ্র সরু হয়ে ফোকাস দৈর্ঘ্য একটু বাড়িয়ে নেয় যেন প্রতিবিম্বটা ঠিক রেটিনার উপরে এসে পড়ে। আবার কাছের কোন জিনিস দেখার জন্যে একই কারণে চোখের লেন্স একটু মোটা হয়ে তার ফোকাস দৈর্ঘ্য একটু কমিয়ে নেয়। ক্যামেরাতেও এই জিনিসটি করতে হয়, সেটিকে বলা হয় ফোকাস করা। আজকাল অনেক ক্যামেরাতে শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে দূরত্ব মাপার এবং নিজে নিজে ক্যামেরার লেন্স সামনে এবং পেছনে নিয়ে ফোকাস করার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ভাল ছবি তোলার জন্যে প্রায় সবাই নিজে দেখে ফোকাস করা পছন্দ করে। চোখের ফোকাস করার সঙ্গে অবশ্যি কোন কিছুর কোন তুলনা হয় না। কোথাও তাকানোর সাথে সাথে চোখ সেটিকে স্পষ্ট করে দেখার জন্যে তার লেন্সটিকে চোখের পলকে ঠিক করে নেয়। ছেলেবেলায় যারা খুববেশি পড়াশোনা করে তাদের চোখের লেন্সকে বেশির ভাগ সময়েই বই খাতার মত খুব কাছের জিনিসের উপর ফোকাস করার জন্যে লেন্সের কেন্দ্রকে মোটা করে রাখতে হয়। তাই পরে অনেক সময় দেখা যায় এটা দূরের কোন জিনিস দেখার জন্যে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু সরুও হতে পারছে না। চোখের সামনে একটি অবতল লেন্স বসিয়ে সেটি দূর করা সম্ভব। তাই লক্ষ্য করে দেখবে বেশিরভাগ পড়ুয়া ছাত্ররা কাছের জিনিস বেশ ভাল দেখতে পারে, কিন্তু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পারে না, আর তাদের সবার চশমার কাঁচই সাধারণত অবতল কাঁচ দিয়ে তৈরি। বয়স্ক মানুষের বেলায় এর উল্টো ব্যাপারটি ঘটে। দেখবে একটু বয়স্ক মানুষ চশমা ছাড়া কোন কিছু পড়ার চেষ্টা করার সময় সেটিকে চোখ থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

আলো রেটিনাতে এসে পড়ার পর সেখানে এক ধরনের বিদ্যুৎ সংকেতের সৃষ্টি হয়। সেই সংকেত যখন চোখের নার্ভের সাহায্যে মস্তিষ্কের মাঝে পৌঁছায় তখনই আমরা জিনিসটাকে দেখি। রেটিনার ঠিক যেখানে চোখের নার্ভ এসে মিলেছে সেটিকে অন্ধবিন্দু বলে, কারণ ঠিক সেই বিন্দুটিতে আলো এসে পড়লেও কিছু দেখা যায় না। একটি কাগজে

একটি যোগ চিহ্ন এবং তার ডান দিকে ইঞ্চি দুয়েক দূরে একটি ছোট কালো বৃত্ত (নিচের ছবি) আঁক। এবারে বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখ দিয়ে যোগ চিহ্নটির দিকে তাকিয়ে

বাম চোখ বন্ধ করে যোগ চিহ্নটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে আসলে কাল বৃত্তটি অদৃশ্য হয়ে যাবে

আস্তে আস্তে কাগজটি তোমার দিকে আনতে থাক। যদিও তুমি যোগ চিহ্নটির দিকে তাকিয়ে আছ তবুও তুমি কালো বৃত্তটি দেখতে পাবে। কাগজটি কাছে আনতে আনতে হঠাৎ এক সময়ে দেখবে কালো বৃত্তটি অদৃশ্য হয়ে গেছে! কাগজটি আরো কাছে আনলে আবার তুমি এটি দেখতে পাবে এবং দূরে সরিয়ে নিলেও দেখতে পাবে, কিন্তু ঠিক ঐ নির্দিষ্ট দূরত্বে বৃত্তটি দেখা যাবে না। ঠিক ঐ সময় বৃত্তটি থেকে আলো ঠিক অন্ধ বিন্দুতে এসে পড়ে বলে সেটিকে দেখা যায় না।

সাধারণত আলো এসে লেন্সের ঠিক বিপরীত দিকে যে অংশে পড়ে সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গাটির নাম ফোভিয়া, এখানে 'কোণ' নামের এক ধরনের কোষ থাকে। আলো প্রচুর পরিমাণে থাকলে কোণ নামের এই কোষগুলো কাজ করতে পারে। কাজেই দেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু এই কোষগুলো করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের রঙ দেখার অনুভূতিও কোণ নামের এই কোষগুলো থেকে আসে। ঠিক কিভাবে বিভিন্ন রঙ দেখা হয় বিজ্ঞানীরা এখনো সে বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হননি, তবে ধারণা করা হয় তিনটি মৌলিক রঙ (যেমন লাল, সবুজ, নীল) দিয়ে সব রঙ দেখা হয়। আমরা এ নিয়ে পরে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত শুধু জেনে রাখি যে কোণ নামের কোষগুলো রঙ সচেতন। যদিও কোন সব রঙই দেখতে পারে তবু দেখা গেছে হলুদাভ সবুজ রঙটি সবচেয়ে বেশি তীব্রভাবে দেখা যায়। হয়তো এই জন্যেই পৃথিবীতে এত গাছপালা, আর সব গাছপালার রঙই সবুজ, ফলে চোখের পক্ষে দেখাও খুব সহজ।

ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার সময় আলো যদি খুব কম হয়ে পড়ে তখন ফিল্মটা পাল্টে একটা বিশেষ ধরনের সুবেদী ফিল্ম ভরে না নিলে আর ছবি তোলা সম্ভব নয়। চোখের বেলাতেও ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম, তবে ক্যামেরার মত কোনকিছু পাল্টাতে হয় না। আলো কম হলে চোখ নিজে নিজেই তার বিশেষ এক ধরনের কোষকে ব্যবহার করা শুরু করে। এই কোষগুলোর নাম রড। ফোভিয়াকে ঘিরে এই রডগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। যদিও এই রডগুলো অস্বাভাবিক কম আলোতেও কাজ করতে পারে, কিন্তু এগুলো রঙ দেখতে পায় না। বিশেষ করে লাল রঙ রড দিয়ে দেখা কঠিন। তোমরা নিজেরাও সেটি পরীক্ষা করে দেখতে পার। একটি লাল ও একটি নীল রংয়ের জিনিস হাতে নিয়ে রাতের বেলা বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে ফেল। প্রথমে মনে হবে ভীষণ অন্ধকার। এতক্ষণ আলোতে থাকার জন্যে কোণগুলো কাজ করছিল এবং রডগুলো অকেজো হয়ে পড়েছিল। বাতি নেভানোর সাথে সাথে কোণগুলো আর কাজ করতে পারছে না, আবার

রডগুলোর কাজ করা শুরু করতে খানিকক্ষণ সময় লাগে বলে সেগুলোও কিছু করতে পারছে না, তাই ঘরটাকে একটু বেশি অন্ধকার মনে হবে। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখবে আস্তে আস্তে ঘরটা চোখের সামনে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মিনিট দশেক পরে তোমার চোখের রডগুলো যখন ঠিকভাবে কাজ করা শুরু করবে তখন তাকিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে যদিও সবকিছুই মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, কোনটার কি রঙ কিন্তু মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। এবার সাথে রাখা লাল ও নীল রংয়ের জিনিসটার দিকে তাকিয়ে দেখ, লাল জিনিসকে মনে হবে কালচে একটা কিছু, কিন্তু নীল জিনিসটাকে অনেক স্পষ্ট দেখা যাবে। (পরবর্তী ছবি দ্রষ্টব্য)।

আগেই বলা হয়েছে রেটিনার ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে ফোভিয়া এবং সেখানে রয়েছে 'কোণ' নামের কোষগুলো। তাই কোনকিছুর দিকে সোজাসুজি তাকালে আলো এসে পড়ে ফোভিয়াতে। কিন্তু খুব ক্ষীণ আলোকের কোনকিছু দেখার জন্যে প্রয়োজন রড, যেগুলো

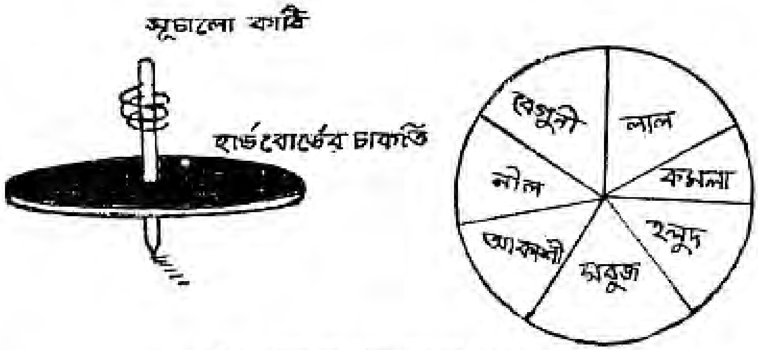


বর্ণালীর সবুজ রঙ দিয়ে সাদা রঙ তৈরি করা সম্ভব

ফোভিয়াকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে। তাই ক্ষীণ আলোকের কিছু দেখার জন্যে সোজাসুজি না তাকিয়ে চোখের কিনারা দিয়ে তাকাতে হয়, তাহলে আলো এসে পড়বে রডে। যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে ভালবাস তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে খুব অস্পষ্ট একটি তারার দিকে সোজাসুজি তাকালে সেটি দেখা যায় না, কিন্তু একটু পাশে তাকালে আবার সেটিকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

চোখ সম্পর্কে বলে শেষ করা কঠিন। মানুষের চোখ সবচেয়ে বেশি যে পরিমাণ আলো দেখতে পারে সেটিকে দশ কোটি ভাগের এক ভাগ করা হলেও তাকে দেখতে পারে। ক্যামেরা দূরে থাকুক পৃথিবীতে এমন কোন যন্ত্রই নেই যা এতবেশি থেকে এত কম আলো এত চমৎকারভাবে বুঝতে পারে। কাজেই মনে রেখো যদিও বলা হয়ে থাকে মানুষের চোখ হচ্ছে ক্যামেরার মত, কিন্তু কথাটি আসলে ভুল। মানুষের চোখের কাছে পৃথিবীর সেরা ক্যামেরা তুচ্ছ ছেলেমানুষী খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়, মানুষের চোখের সাথে আর কোন কিছুরই তুলনা হয় না। এরকম অপূর্ব দুটি চোখ নিয়ে জন্ম নেয়া যে কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার ভেবে দেখেছ?

## রঙ

আমরা আগে দেখেছি সূর্যের আলো আসলে সাতটি ভিন্ন রংয়ের মিশ্রণ। তার উল্টোটাও সত্যি, সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রঙকে ঠিকভাবে একত্র করতে পারলে সাদা রঙ ফিরে পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে নিউটন একটি প্রিজম দিয়ে সূর্যের আলোকে সাতটি রংয়ে ভাগ করেছিলেন, আরেকটি প্রিজম উল্টো করে বসিয়ে সেই সাতটি রঙকে একত্র করে আবার সেই বর্ণহীন সূর্যের আলো ফিরে পেয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে তোমরাও সেটি একটু অন্যভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পার। দুই কি তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি বোর্ড গোল চাকতির মত করে কেটে তার মাঝখানে একটি সূচালো কাঠি বা পেরেক ঢুকিয়ে নিলে সেটি লাটু হিসেবে (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) ব্যবহার করা যায়। লাটুর উপরে একটা সাদা কাগজ লাগিয়ে সেখানে ছবিতে দেখানো পরিমাণে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আকাশী, নীল এবং বেগুনী রঙ করে নাও। এবার লাটুটা ঘুরিয়ে দিলেই দেখবে রঙগুলো আর

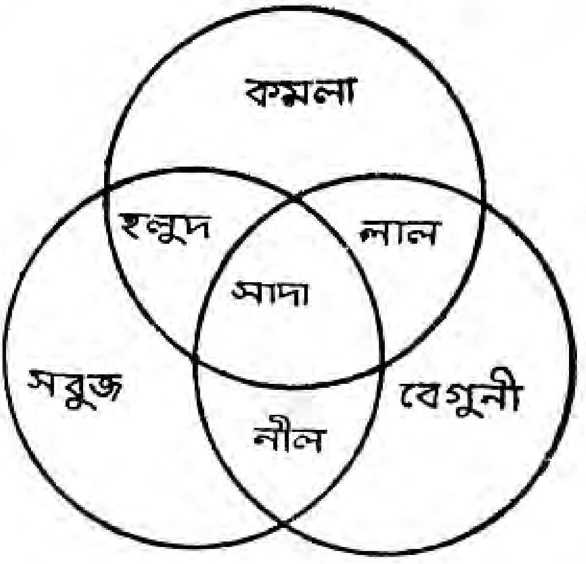


আলোর যোগ জাতীয় মিশ্রণ

আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে না, সবগুলো রঙ মিলে সেটিকে সাদা বলে মনে হচ্ছে। রঙয়ে একটু হেরফের হলে রঙটা একটু ধোঁয়াটে বা লালচে মনে হতে পারে, কিন্তু কিছুতেই বোঝা যাবে না এখানে সাতটি রঙই রয়েছে।

এর কারণটা কি? নিশ্চয়ই এখানে সাতটি রঙই রয়েছে, কিন্তু আমরা সেটা দেখছি না কেন? তার কারণ হচ্ছে আমাদের চোখ। চোখ কেমন করে রঙ দেখতে পায় সেটি নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে, তবে প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে চোখ আসলে তিনটি রঙ দিয়েই

সবগুলো রঙ দেখতে পায়। তোমরা যারা রঙিন ফটো দেখছ তাদের কাছে যদিও ফটোটাতে সব কয়টি রঙই রয়েছে বলে মনে হয়েছে, আসলে কিন্তু সেটি তৈরি করা হয়েছে লাল, নীল ও সবুজ এই তিনটি রঙ দিয়ে (তবে ছবিকে স্পষ্ট সাদা করার জন্যে কালো রঙও ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেগুলো তো আর রঙ নয়)। রঙিন টেলিভিশনের রঙও আসলে এই তিনটি রঙ দিয়ে তৈরি। রঙিন টেলিভিশনের খুব কাছে গেলে এই লাল নীল ও সবুজ রংয়ের বিন্দুগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায়। একটু দূর থেকে দেখলে আর আলাদা আলাদা ভাবে রংয়ের বিন্দুগুলো দেখা যায় না। তারা বিভিন্ন পরিমাণে একত্র হয়ে অন্য রংগুলো তৈরি করে। তিনটি মাত্র রঙ ব্যবহার করে প্রথম রঙিন ছবি তুলেছিলেন সেই ম্যাক্সওয়েল যিনি তাঁর তাড়িত চৌম্বক সমীকরণের জন্যে জগৎবিখ্যাত। আজকালকার ফিল্মেও কোন কিছুর ছবি তোলা হলে সেই জিনিসটি লাল, নীল ও সবুজ অংশগুলোর ছবি একই সাথে, একই জায়গায় কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে নেয়া হয়। ছবিতে যখন এই লাল নীল ও সবুজ রঙ আমরা দেখি, রংগুলোকে আর আলাদাভাবে ভাগ করতে পারি না। রংয়ের বিন্দুগুলো এত কাছাকাছি থাকে যে খালি চোখের পক্ষে সেটা আলাদা করা সম্ভব নয়। কাজেই যদি ছবির একজায়গায় খুব পাশাপাশি একটি লাল ও একটি সবুজ বিন্দু থেকে লাল সবুজ আলো চোখে এসে পড়ে আমাদের চোখ সেটিকে আর আলাদা করে দেখতে পারবে না। শুধু তাই নয় বিন্দুটিকে তখন লালও মনে হবে না, সবুজও মনে হবে না, মনে হবে হলুদ। তেমনি সবুজ আর বেগুনী রঙ মিলে হয় নীল বেগুনী আর কমলা মিলে হয় লাল, আর সব কয়টি রঙ মিলে হয় সাদা।

রংয়ের এই মিশ্রণকে বলা হয় যোগ জাতীয় মিশ্রণ। এই মিশ্রণটি হয় একেবারে চোখের ভেতর। মনে রেখো তুমি যদি একটা বাটিতে লাল রঙ আর সবুজ রঙ মিশিয়ে নাও সেটি কিন্তু হলুদ হবে না। তখন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার হয়ে যায়। রংয়ের ছোট ছোট কণিকা মিলে যাবার ফলে তখন হয়তো একটা লাল রংয়ের কণিকাকে সবুজ রংয়ের কণিকার ভেতর দিয়ে দেখতে হবে, সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু যদি কোথাও তুমি লাল ও সবুজ রংয়ের বিন্দু খুব পাশাপাশি বসাতে পারো তাহলে দূর থেকে সেটিকে হলুদ দেখাবে। সেটি খুব সহজ ব্যাপার নয়। যেটি করা সম্ভব সেটি হচ্ছে, আগে যেভাবে লাটুর উপরে রঙ করে নিয়েছিলে সেভাবে সাতটি রঙ না করে শুধু সবুজ ও লাল রঙ ব্যবহার কর। কতটুকু সবুজ ব্যবহার করা উচিত তা নির্ভর করে কি রকম গাঢ় রঙ ব্যবহার কর, তার উপরে। সেটা তোমরা নিজেরাই বের করে নিতে পারবে। লাটুটি ঘুরিয়ে দিলে উপরের যে কোন একটা বিন্দু থেকে লাল এবং সবুজ দুরকম আলোই চোখের ভেতরে এসে পড়বে। লাটু যদি যথেষ্ট জোরে ঘুরতে থাকে তাহলে চোখ আলাদা করে রঙ দুটিকে দেখতে পারবে না ফলে রংয়ের যোগ জাতীয় মিশ্রণে যা হওয়া উচিত তাই হবে; লাটুটিকে মনে হবে হলুদ।

আমরা আগে একসময়ে বলেছিলাম আলোর রঙ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। বুঝতেই পারছ আমাদের চোখ কিন্তু ধরতে পারবে না একটি আলো আসলেই হলুদ, না লাল ও সবুজ রংয়ের মিশ্রণ! এমনিতে যে সমস্ত হলুদ রঙ দেখা যায় সেগুলোতে হলুদ রঙ ছাড়াও রয়েছে লাল, কমলা, সবুজ এমনকি হয়তো অল্প নীল রঙ! সবগুলো যখন একই সাথে চোখের ভেতরে এসে ঢোকে তখন চোখের কাছে সেটিকে মনে হয় হলুদ! কাজেই দেখতে পাচ্ছ আমাদের দেখার ব্যাপারে রঙয়ের এই যোগ

জাতীয় মিশ্রণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আসলে দেখি মাত্র তিনটা রঙ। এই তিনটা রঙ আবার একত্র হয়ে অন্য রংয়ের অনুভূতি সৃষ্টি করে। কোন কোন রঙ একত্র হলে কোন রঙটি দেখা যাবে সেটিকেই বলা হয় যোগ জাতীয় মিশ্রণ। কোন কোন মানুষের চোখ আবার তিনটি রংয়ের ভিতরে একটি বা কখনো কখনো দুটি রঙই দেখতে পায় না। তাদের বলা হয় রঙ অচেতন। তাদের রঙ সম্পর্কে ধারণা সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন—অনেকের কাছে লাল এবং সবুজ রংয়ের মাঝে কোন পার্থক্য পর্যন্ত নেই। রঙ অচেতন মানুষ খুব বিরল নয়, তুমি তোমাদের পরিচিতদের লাল এবং সবুজ রংয়ের পার্থক্য ধরতে বলে খুঁজে বের করতে পার। মনে করো না তারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত! তাদের রংয়ের ধারণা আমাদের থেকে ভিন্ন এ ছাড়া আমাদের সাথে তাদের আর কোন পার্থক্য নেই।

একটা জিনিসের রঙ কি হবে সেটা নির্ভর করে সেটি কি রংয়ের আলো দিয়ে দেখা হচ্ছে। সূর্যের আলোতে যে জিনিসটিকে লাল মনে হয় সবুজ আলোতে সেটিকে প্রায় কাল দেখায়। বিশ্বাস না হলে সবুজ রংয়ের একটা কাঁচের ভিতর দিয়ে লাল একটা ফুল বা অন্য কিছু দেখার চেষ্টা করে দেখ। আবার হলুদ আলোতে সেটিকে পুরোপুরি লাল না দেখিয়ে খানিকটা কমলা রংয়ের দেখাবে। তেমনি লাল আলোতে সবুজ জিনিসকে দেখায় কালো, লাল কাঁচের ভেতর দিয়ে সবুজ পাতার দিকে তাকালেই সেটা বুঝতে পারবে।

আবার হলুদ আলোতে নীল জিনিসকে দেখায় সবুজ এবং এর উল্টোটাও সত্যি, অর্থাৎ নীল আলোতে হলুদ জিনিসকে দেখায় সবুজ! অনেকের কাছে পুরো ব্যাপারটাই উল্টোপাল্টা মনে হতে পারে, কিন্তু দেখবে রঙটা কিভাবে আসে বুঝতে পারলে পুরো ব্যাপারটাই সহজ হয়ে যাবে।

একটা জিনিসের রঙ লাল—কথাটির অর্থ, এর উপরে আলো এসে পড়লে লাল আলো ছাড়া অন্য সব আলো শোষিত হয়ে যায় (নিচের ছবি)। কাজেই শুধু লাল আলোটাই প্রতিফলিত এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে আসে, ফলে সেটিকে দেখায় লাল, লাল আলো বলতে কিন্তু মনে কোরো না একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গের লাল আলো, তার মাঝে হলুদ, কমলা, এমন কি খানিকটা সবুজ রংয়ের আলো পর্যন্ত থাকতে পারে। আমাদের চোখে তাদের মিলিত মিশ্রণকে দেখাবে লাল। ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে কখনো সেটিকে দেখায় গাঢ় লাল, হালকা লাল, কখনো কালচে লাল। জবা ফুল আর কৃষ্ণচূড়া দুটির রঙই লাল, কিন্তু তবু তার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। একটি লাল রংয়ের কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালেও একই ব্যাপার ঘটে। তার ভেতর দিয়ে লাল (এবং অল্প কিছু হলুদ, কমলা বা সবুজ) আলোটা শুধু প্রতিসারিত হয়ে আসতে পারে, অন্য সব রংয়ের আলো শোষিত হয়ে যায়। তেমনি একটি গাছের পাতাকে সবুজ দেখানোর অর্থ তার উপরে আলো এসে পড়লে সবুজ (এবং অল্প হলুদ ও নীল) রঙ ছাড়া অন্য সব রংয়ের আলো শোষিত হয়ে যাবে। কাজেই যে রঙটা ফিরে আসে সেটিকে আমরা দেখি সবুজ।

এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সবুজ পাতাটিকে লাল কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলে সেটিকে কেন কালো দেখায়। সবুজ পাতা থেকে প্রধানত সবুজ আলো ফিরে আসছে। কিন্তু লাল কাঁচ, লাল ছাড়া অন্য রঙ প্রায় পুরোটাই শোষণ করে নেবে। কাজেই পাতার সবুজ রঙটাও প্রায় পুরোটাই শোষণ করে নেবে। ফলে পাতা থেকে কোন আলোই লাল কাঁচ

ভেদ করে যেতে পারবে না। তাই সেটিকে দেখাবে কালো। ঠিক একই কারণে সবুজ রংয়ের একটা কাঁচের ভেতর দিয়ে লাল একটি ফুলকে দেখায় কালো।

একটি রংয়ে আসলে অন্য রঙও কিছু পরিমাণে মিশে থাকে বলে অল্প কয়টি রঙ ব্যবহার করেই সব কয়টি রঙ তৈরি করে নেয়া যায়। কিভাবে সেটি সম্ভব বোঝার জন্যে প্রত্যেকটি রঙকে একটি করে রঙিন কাঁচ হিসাবে কল্পনা করে নাও। আমরা যেসব রঙ ব্যবহার করি আসলেও সেগুলো অসংখ্য ছোট ছোট রঙিন কাঁচের মত। কোথাও রঙ দেয়া

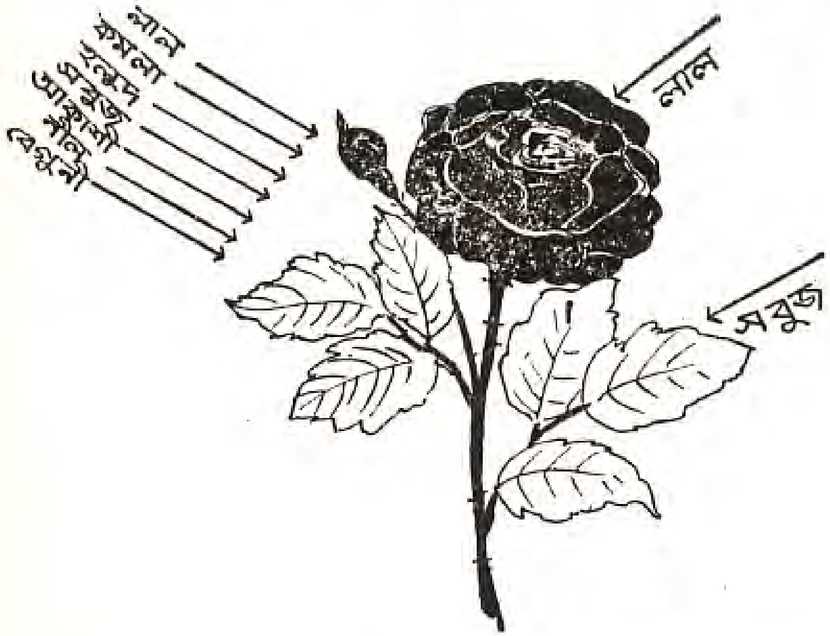


কোন কিছু লাল দেখানোর অর্থ সেটিতে আলো এসে পড়লে লাল ছাড়া অন্য সব কয়টি রঙ শোষিত হয়ে যাবে

হলে সেগুলো সেখানে রয়ে যায়, তাই তার ভেতর দিয়ে যে আলো বের হয়ে আসে সেগুলোর অবস্থা হয় রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে বের হওয়ার মত, যার ফলে আমরা সেই রঙটি দেখতে পাই। ধরা যাক তোমার কাছে লাল, নীল ও হলুদ রঙ রয়েছে (নিচের ছবি)। নীল আর হলুদ রঙ মিশিয়ে সবুজ রঙ তৈরি করা সম্ভব, তখন কল্পনা করে নিতে পার আলোকে অসংখ্য ছোট ছোট নীল আর হলুদ রংয়ের কাঁচের ভেতর দিয়ে

আসতে হচ্ছে। নীল কাঁচ নীল ছাড়াও খানিকটা সবুজ এবং বেগুনী আলোকে বের হতে দেয়। আবার হলুদ কাঁচের ভেতর দিয়ে হলুদ ছাড়াও খানিকটা সবুজ আর লাল রঙ বের হতে পারে। তাই দেখতে পাচ্ছ একটা নীল কাঁচ আর হলুদ কাঁচ পাশাপাশি থাকলে, নীল

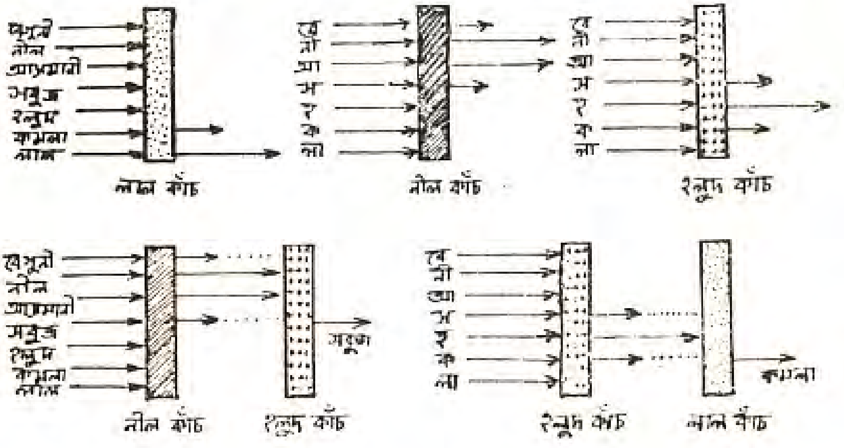


নীল ও হলুদ রঙ ব্যবহার করে সবুজ রঙ এবং হলুদ ও কালো রঙ ব্যবহার করে কমলা রঙ তৈরি করার উদাহরণ

কাঁচের ভেতর দিয়ে যে বেগুনী ও নীল রঙ বের হয় সেটা হলুদ কাঁচের ভেতর দিয়ে যেতে পারে না, শুধু সবুজটা যেতে পারে তাই যে আলো বের হয়ে আসে (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ছবি) সেটির রঙ সবুজ। কাজেই এখন বুঝতে পারছ কিভাবে অন্য রঙগুলো তৈরি হওয়া সম্ভব। রংয়ের এই জাতীয় মিশ্রণকে বলা হয় বিয়োগ জাতীয় মিশ্রণ (নিচের ছবি)। এটি জেনে রাখলে তিনটি রঙ দিয়ে সব রঙ তৈরি করা সম্ভব।

## চোখের অন্য ব্যবহার

দেখা ছাড়াও চোখের আরো একটা ব্যবহার আছে, সেটি হচ্ছে দূরত্বের অনুভূতি দেয়া। এ জন্যে দুটি চোখেরই দরকার। বহুদূরের কোন জিনিস দেখার জন্যে দুটি চোখই সোজা সামনের দিকে তাকায়, কিন্তু কাছের একটা জিনিস দেখার জন্যে বাম চোখকে একটু ডানদিকে আর ডান চোখকে একটু বামদিকে ঘুরতে হয়। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে তোমার এক বন্ধুকে বল তোমার আঙুলের দিকে তাকাতে। এবারে আঙুলটি তোমার বন্ধুর চোখের কাছে নিয়ে যাবার সময় তার চোখ দুটি লক্ষ্য কর দেখবে কিভাবে চোখ দুটি ভেতরের দিকে ঘুরে যাচ্ছে। চোখ দুটির এই ভেতরের দিকে ঘুরে যাওয়া থেকে আমাদের

মস্তিষ্ক দূরত্বের একটা অনুভূতি পায়। তাই দেখবে মাথা না নাড়িয়ে এক চোখ বন্ধ করে সুঁইয়ে সুতা ঢোকানো খুব মুশকিল। সুতাটা সুঁইটির সামনে কিংবা পেছনে চলে যাচ্ছে, কারণ সুঁইটা কত দূরত্বে আছে একটি চোখ দিয়ে বোঝা মুশকিল। মানুষের দুটি চোখই সামনে, তাই কোন কিছুর দূরত্ব বোঝার জন্যে সেটির দিকে তাকালেই চলে। পাখিদের দুচোখ দু'পাশে, তাই তাদের দূরত্ব বোঝার জন্যে সব সময় মাথা নেড়ে একবার ডান চোখ দিয়ে দেখে, আরেকবার বাম চোখ দিয়ে দেখতে হয়। যে কোন একটা মোরগকে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলেই তুমি এটা দেখতে পাবে।

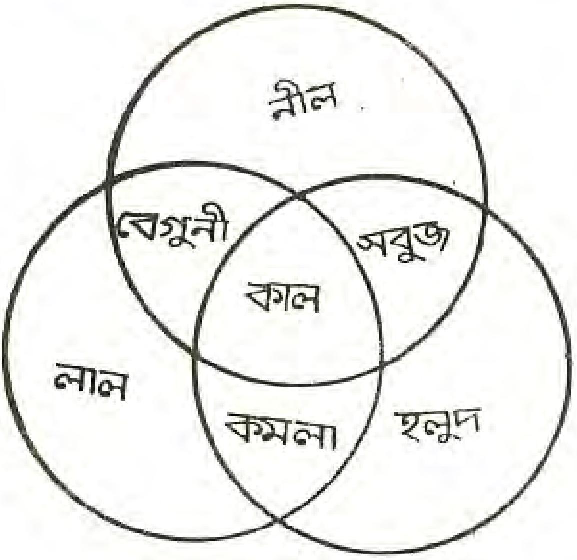


আলোর বিয়োগ জাতীয় মিশ্রণ

আমাদের চোখের এই বিশেষ ব্যবহারের জন্যে আমরা একটা জিনিসের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা একই সাথে অনুভব করতে পারি। যে সব জিনিসের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা তিনটিই রয়েছে তাকে ত্রিমাত্রিক বলা হয়। আমাদের চারপাশের সব কিছুই ত্রিমাত্রিক কিন্তু আমরা যখন ছবি তুলি সেটি দ্বিমাত্রিক হয়ে যায়, কারণ ছবিতে বিভিন্ন দূরত্বে জিনিসকে দেখার জন্যে নলের চোখ দুটি ঘোরাতে হয় না। ছবি যদি ত্রিমাত্রিক হতো তাহলে অন্য ব্যাপার হতো। মনে হত ছবিটা কাগজ ফুঁড়ে উঁচু হয়ে আছে এবং হাত দিয়ে সেই ছবি যেন ধরা সম্ভব! আজকাল বিভিন্ন উপায়ে ত্রিমাত্রিক ছবি তোলা হয়। সবচেয়ে চমকপ্রদ উপায়টির নাম হলগ্রাফি। ডেনিস গ্যাবরকে হলগ্রাফি আবিষ্কারের জন্যে সবচেয়ে সম্মানজনক নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। হলগ্রাফি করাতে লেসার ব্যবহার করতে হয়। কাজেই সেটি খুব সহজ ব্যাপার নয়। তোমরা অবশ্য অন্য উপায়ে ত্রিমাত্রিক ছবি তৈয়ার করতে পার, সেটি যদিও খুব সহজ কিন্তু হলগ্রাফি ছবির মতই চমকপ্রদ।

মনে করো একটা লাল রেখার ডান পাশে একটা সবুজ রেখা আঁকা হলো। এবারে তুমি যদি একটা বিশেষ চশমা পরে নাও যেটির বাম চোখে লাল রংয়ের কাঁচ আর ডান চোখে সবুজ রংয়ের কাঁচ তাহলে রেখা দুটির দিকে তাকালে কি দেখা যাবে? সবুজ কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালে সাদা কাগজে আঁকা সবুজ রেখাকে আলাদা করে দেখা যাবে না. সবুজের সাথে সবুজ মিশে থাকবে। কিন্তু লাল রেখাটিকে স্পষ্ট কালো একটা রেখা হিসেবে দেখা যাবে। তেমনি লাল কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালে সাদা কাগজে আঁকা লাল রেখাটি বোঝা যাবে না, কিন্তু সবুজ রেখাটি স্পষ্ট কালো রেখা হিসেবে দেখা যাবে। কাজেই (পরবর্তী পৃষ্ঠার উপরের ছবি) বাম চোখ দিয়ে তুমি ডান পাশের রেখাটি দেখবে আর ডান চোখ দিয়ে দেখবে বাম পাশের রেখাটি। কিন্তু আমাদের দুটি চোখ দিয়ে দুটি ভিন্ন জিনিস দেখে অভ্যস্ত নই, কখনোই আমরা দুই চোখ দিয়ে দুটি জিনিস দেখি না। কাজেই চোখ দুটি একটু উপরে তাকাবে, যেখানে মনে হবে রেখা দুটি মিলে এক হয়ে গেছে। সেখানে তাকালে দুটি চোখকে একটি রেখাই দেখতে হবে—কিন্তু আসলে সেখানে কোন রেখা নেই। কাজেই দেখতে পাচ্ছ দুটি রেখার মাঝখানের ফাঁকটুকু বাড়িয়ে বা কমিয়ে সেই নূতন

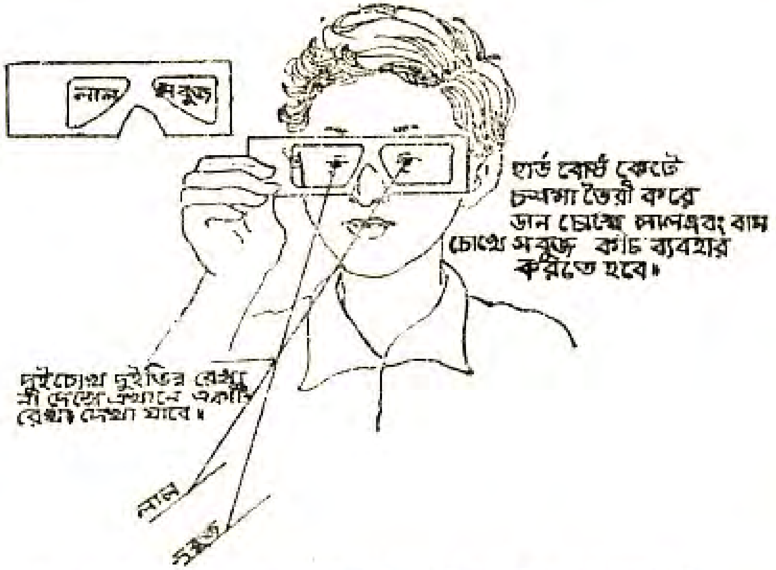


লাল এবং সবুজ রেখার মাঝখানে ফাঁক বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দৃশ্যটির উচ্চতা বাড়ানো কিংবা কমানো সম্ভব

রেখাটির উচ্চতা বাড়ানো বা কমানো সম্ভব। কাজেই শুধু দুটি রেখা না এঁকে যদি পুরো ছবিটা লাল ও সবুজ রেখা দিয়ে আঁকা হয় এবং যে অংশটুকু উঁচু দেখানো উচিত সেখানে রেখাদুটির মাঝখানে ফাঁক বেশি রাখা হয় তাহলে সেটি খুব মজার একটি ছবি হবে। তোমাদের সুবিধার জন্যে একটা ছবি এঁকে দেয়া (পরবর্তী পৃষ্ঠার নিচের ছবি) হলো।

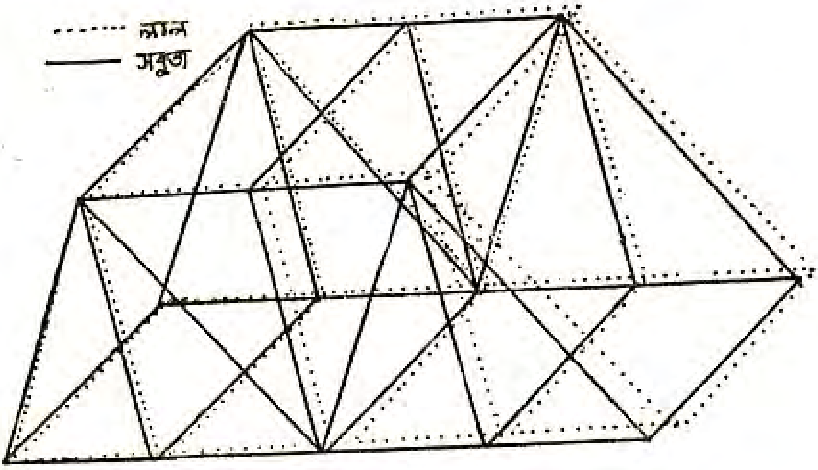


এই ছবিটি লাল ও সবুজ চশমা দিয়ে দেখলে ত্রিমাত্রিক দেখাবে

তোমরা পাতলা কাগজে লাল ও সবুজ কলম দিয়ে কপি করে নিও। ছবিটি দেখার জন্যে সেই বিশেষ চশমাটি তৈরি করা খুব সহজ। বোর্ড দিয়ে ছবিতে দেখানোর জন্যে চশমার মত করে কেটে নিয়ে একটিতে লাল অন্যটিতে সবুজ রংয়ের পলিথিন লাগিয়ে নিও। বিয়ে বাড়িতে বা নাটক করার সময় রঙিন আলো তৈরি করার জন্যে বাল্বের উপরে যে পাতলা রঙিন পলিথিন লাগানো হয় সেটি ব্যবহার করা সবচেয়ে সহজ।

চোখ একটা কিছু দেখার পর এক সেকেণ্ডের ষোল ভাগের একভাগ সময় পর্যন্ত সেটি দেখতে থাকে। এই জন্যে সিনেমা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সিনেমাতে কিছু একটা নড়ছে দেখানোর জন্যে সেকেণ্ডে ষোলটির বেশি ছবি তোলা হয়। সেগুলো যখন দেখানো হয় চোখ সেই ছবিগুলোকে আলাদা করে বুঝতে পারে না। ফলে মনে হয়, একটি ছবিতেই কিছু একটা বুঝি সত্যি সত্যি নড়ছে। এই ব্যাপারটা তোমরা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখতে পার। ইঞ্চি দুয়েক চওড়া এবং ফুটখানেক লম্বা একটা কাগজ মাঝখানে ভাঁজ করে নাও। এবারে উপরের এবং নিচের কাগজ মোটামুটি একই জায়গায় একই জিনিসের দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি আঁক (পাখির ডানার উপর এবং পাখির ডানা নিচে)। এবার কাগজের উপরের অংশটি একটি পেন্সিল দিয়ে ভাল করে পাকিয়ে নাও যেন ছেড়ে দিলে গোল হয়ে পাকিয়ে একপাশে সরে থাকে, যার ফলে নিচের ছবিটা বের হয়ে থাকবে। এখন একটা পেন্সিল দিয়ে (নিচের ছবি) উপরের গোল করে পাকানো কাগজটি টেনে সোজা করে দিলে নিচের ছবিটা ঢেকে গিয়ে উপরের ছবিটা দেখা যাবে। আবার পেন্সিলটা পাশে সরিয়ে আনলে উপরের কাগজটা গোল হয়ে পাকিয়ে গিয়ে নিচের ছবিটা বের হয়ে আসবে। খুব তাড়াতাড়ি করতে পারলে একই জায়গায় একবার পাখিটার ডানা উপরে একবার নিচে দেখতে পাবে, যার ফলে মনে হবে পাখিটা বুঝি ডানা কাঁপাচ্ছে।

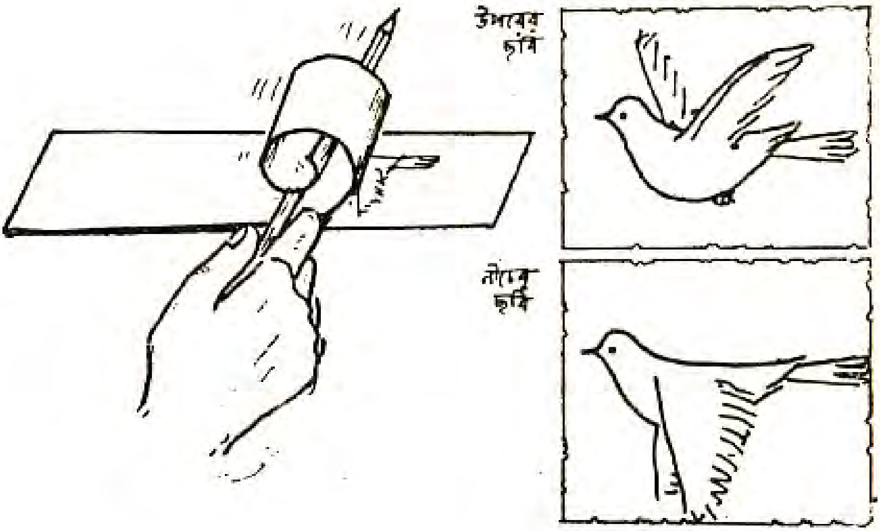


দ্রুত একবার উপরের ছবি, একবার নিচের ছবি দেখলে মনে হবে পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে

## দেখা, দেখে না দেখা; না দেখে দেখা

না আমি তোমাদের মোটেই ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করছি না, আমরা চোখ দিয়ে শুধু যে দেখতে পাই তাই নয়, সত্যি সত্যি কখনো কখনো আমরা দেখেও দেখিনা, আবার কখনো না দেখেও দেখি। তার কারণ রয়েছে। আমাদের দেখাটা শুধু চোখের ব্যাপার নয়। এটি অনেকটুকু মস্তিষ্কেরও ব্যাপার। একটি ছোট বাচ্চা যখন জন্ম নিয়ে তাকায় সে যা দেখে তার কোন কিছুরই তার কাছে কোন অর্থ নেই, সবকিছুই নানা ধরনের নানা রংয়ের আলো। খুব ধীরে ধীরে সে দেখে দেখে বুঝতে পারে কোন আলোটার কি অর্থ, তখনই শুধু সে সত্যিকার অর্থে দেখে। চোখ শুধুমাত্র আলোর সংকেতটুকু মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়, মস্তিষ্ক সেটি কি তা আমাদের জানায়। কাজেই নতুন কিছু দেখলে মস্তিষ্ক তার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সেটা বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু যেসব জিনিস আমরা দেখে অভ্যস্ত নই সেরকম একটা কিছু দেখলে আমাদের খুব আসতি হতে থাকে। (নিচের ছবি) যদিও বুঝতে পারি যে, আসলে এটি শুধুমাত্র ধাঁধা লাগানোর জন্য তৈরি, তবুও দেখলে খুবই অস্বস্তি হয়, কারণ আমাদের মস্তিষ্ক এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেটা গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু চোখ সেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তাই সেটা অস্বীকারও করতে পারে না।

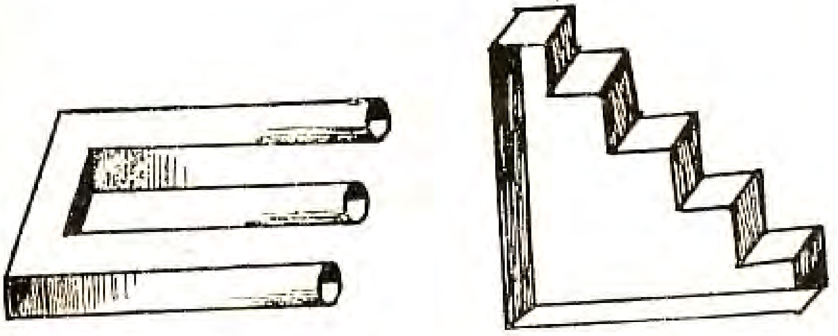

এই ছবি দুটির মাঝে গণ্ডগোলটি কোথায় বলতে পারো?

আরো বলা হয়েছে, আমরা কখনো কখনো দেখেও দেখি না! কথাটি বিশ্বাস না হলে (নিচের ছবি) কয়েকটি চোখের ধাঁধার দিকে তাকাও। প্রথম ছবির সরলরেখা দুটি কি সমান্তরাল? বৃত্তটি কি সমান্তরাল? বৃত্তটি কি ঠিক করে আঁকা হয়েছে? আমরা ঠিকই দেখছি, কিন্তু তবু মনে হবে সরলরেখা দুটি মাঝে ফাঁক হয়ে গেছে, বৃত্তটা যেন উপরে

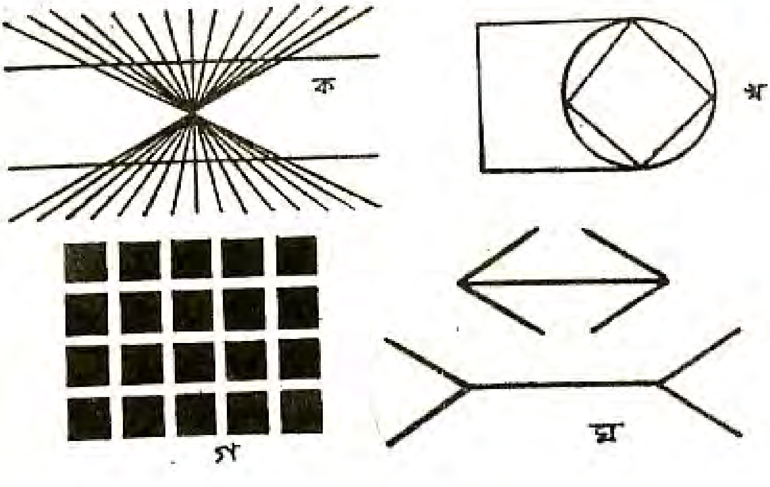


(ক) রেখা দুটি সমান্তরাল, মাঝখানে বেঁকে যায়নি। (খ) বৃত্তটি উপরে নীচে এবং দুপাশে চাপা নয় (গ) মাঝখানের সাদা অংশে কালো ছায়া দেখে যাবে (ঘ) উপরের রেখাটি নিচের রেখা থেকে একটু বড়

নিচে আর দু'পাশে একটু চাপা! আবার প্রায় সময়েই আমরা একটা কিছু না থাকলেও দেখি। মাঝের ছবিতে কালো ক্ষেত্রগুলোর মাঝে কোন কিছু নেই, তবু কালো কালো ছায়া রয়েছে বলে মনে হতে থাকে। তাই সব সময়ই আমরা দেখে যে ধারণা করি সেটা ঠিক নাও হতে পারে। পরের ছবিতে কোন্ রেখাটি বড় কোন্‌টি ছোট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একবার মেপে দেখ তুমি বোকা বনে যাবে!

কাজেই বুঝতে পারছ আমরা সবসময়ই যে দেখি তা ঠিক নয়, কখনো কখনো দেখেও দেখি না। আবার কখনো কখনো না দেখেই মনে হয় দেখছি!

## আলোর উৎস

আলো সম্পর্কে, আলো দেখা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য মোটামুটি শেষ। কিন্তু আলোটা কিভাবে আসে সেটি না জানা পর্যন্ত ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। সেটা জানতে হলে আমাদের পরমাণু সম্পর্কে দু'একটা জিনিস বুঝতে হবে। এতদিন তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে জেনে গেছ যে, বিশ্ব জগতের সবকিছুই পরমাণু দিয়ে তৈরি। সব মিলিয়ে একশো তিন ধরনের পরমাণু রয়েছে। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, আর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াস তৈরি হয় প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। প্রোটন আর নিউট্রনের ভর প্রায় সমান, ইলেকট্রনের ওজন খুব কম—একটি প্রোটনের ভর প্রায় দুই হাজার ইলেকট্রনের ভরের সমান। সবচেয়ে সহজ পরমাণু হচ্ছে হাইড্রোজেনের পরমাণু। এই পরমাণুর নিউক্লিয়াসটি হচ্ছে একটা মাত্র প্রোটন, কোন নিউট্রন নেই। বাইরে রয়েছে একটা মাত্র ইলেকট্রন। এটি সব সময়েই সত্যি, যে কয়টি প্রোটন থাকবে বাইরে নিউট্রনও থাকবে সেই কয়টি। যেমন লোহার পরমাণুতে ২৬টি ইলেকট্রন, কারণ লোহার নিউক্লিয়াসে প্রোটনও ২৬টি। লোহার নিউক্লিয়াসে অবশ্য আরো তিরিশটি নিউট্রন রয়েছে। বড় পরমাণুর উদাহরণ হচ্ছে ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসে রয়েছে ৯২টি প্রোটন, ১৪৬টি নিউট্রন! কাজেই তার বাইরে রয়েছে ৯২টি ইলেকট্রন।

পরমাণুর বাইরে ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) ঘুরতে থাকে। পরমাণু যত বড় হয়, ইলেকট্রনগুলোর কক্ষপথও তত বেশি হয়ে থাকে, সেগুলো তত জটিলও হতে থাকে। পরমাণুতে যদি কোনভাবে বাইরে থেকে খানিকটা শক্তি দেয়া যায় তাহলে ইলেকট্রনগুলো মাঝে মাঝেই একটা ছোট কক্ষপথ থেকে ছুটে বের হয়ে বড় কক্ষপথে চলে যায় (খুব বেশি শক্তি দিলে সেটি ছুটে একেবারে বাইরে চলে যেতে পারে)। একটা ইলেকট্রন ছোট কক্ষপথ থেকে বের হয়ে বড় কক্ষপথে গিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতরে সেটি কিংবা অন্য একটি ইলেকট্রন বড় একটা কক্ষপথ থেকে ফাঁকা ছোট কক্ষপথে ফিরে আসে। এবারে আগের বারের উল্টো ব্যাপারটি ঘটে, খানিকটা শক্তি পরমাণু থেকে আলো হিসেবে বের হয়ে আসে। শক্তি যত বেশি থাকে আলোর কম্পনও তত বেশি। তাই যখন বেশি শক্তি বের হয় তখন আলোটা হয় বেগুনী বা অতি বেগুনী। শক্তি যখন কম থাকে তখন আলোটা হয় লাল কিংবা অবলাল!

কাজেই বুঝতে পারছ কোনভাবে পরমাণুকে শক্তি দেয়া গেলে সেটি ইলেকট্রনকে এক কক্ষপথ থেকে আরেক কক্ষপথে পাঠিয়ে শক্তিটা ব্যবহার করে। আবার ইলেকট্রন আগের কক্ষপথে ফিরে আসার সময় শক্তিটা আলো হিসেবে বের করে দেয়। সাধারণ একটা ম্যাচের কাঠি জ্বাললেও যে আলো বের হয়ে আসে তার পেছনে রয়েছে এরকম লক্ষ কোটি পরমাণুর ভেতরে ইলেকট্রনের স্থান বদল।

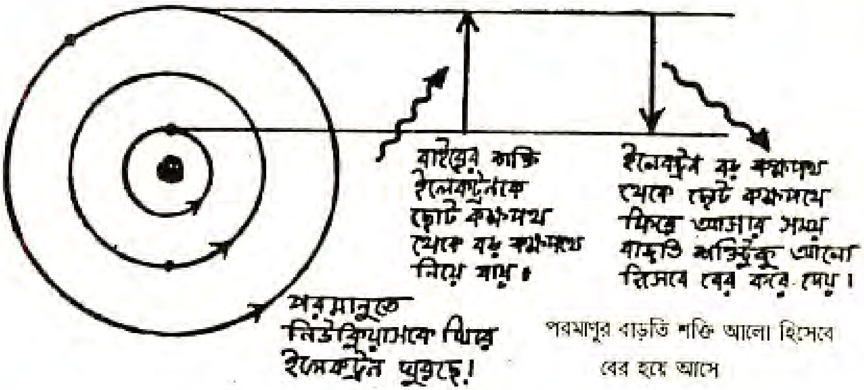


পরমাণুর বাড়তি শক্তি আলো হিসেবে বের হয়ে আসে

প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজানো আছে। কাজেই একটা পরমাণু থেকে শুধু কিছু কিছু বিশেষ কম্পনের আলো বের হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে গবেষণা করে সেই সব বের করে টুকে রেখেছেন। কাজেই আজকাল যে কোন আলো দেখলেই সেটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা কম্পনগুলো বের করে সেটি কি ধরনের পরমাণু থেকে এসেছে বলে দেয়া সম্ভব। আগে তোমাদের বলা হয়েছে লবণ ব্যবহার করে ৫৮৯০ অ্যাঙ্গস্টর্ম লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো পাওয়া সম্ভব। তার কারণ এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। লবণে সোডিয়ামের যে পরমাণু রয়েছে সেটিতে ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে যাবার সময় ঠিক এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে থাকে।

## পরিশিষ্ট

পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হবার পর তাদের সভ্যতার শুরু হয়েছিল আগুন জ্বালানো দিয়ে। প্রথম জ্বালানো আগুনের সেই আলো দেখে সেই সব মানুষের মনে কি প্রশ্ন জেগেছিল আজ আমরা তা কেউ জানি না। হাজার হাজার বিজ্ঞানীর হাজার বছরের সাধনার পর আজকাল আলোর দিকে তাকিয়ে আমরা অনেক কিছু বলে দিতে পারি সত্যি, কিন্তু এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর অজানা রয়ে গেছে। সেই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে পেতে আরো অনেক নতুন প্রশ্নের জন্ম হবে, এর কোন শেষ নেই।

ভাগ্যিস শেষ নেই, এ ছাড়া বেঁচে থাকাটা না জানি কি বিরক্তিকর হয়ে উঠত।